দূষণ অর্থনীতি, নৈতিকতা, প্রবৃদ্ধি ও সমতায়নে দূষণ নিয়ন্ত্রণ নীতিঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশ

Pollution Economics, Ethics, Controlling Policy for Growth and Equity: Aspect Underdeveloped Countries like Bangladesh

মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার*

সারকথা

দূষণ অর্থনীতির ধারণাগত বিশেষণ, দূষণের প্রকরণ, মনুষ্য সৃষ্টির কারণে সমগ্র পরিবেশের উপর বিরূপ ও ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। এর কারণে উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের উপর রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়, ফলস্বরূপ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। মনুষ্য সৃষ্ট দূষণ অর্থনীতি ও প্রতিকূল পরিবেশ এর কারণে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সমতায়ন ও উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। দূষণের উৎস, কারণ, ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিত্রাণের জন্য করণীয় নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা কিভাবে কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে তা এ প্রবন্ধে উলেখ করা হয়েছে। দূষণ পরিবেশ ভারসাম্য উন্নয়নে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ এর মাত্রাগত বিশেষণ তুলে ধরা হয়েছে। প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও সমতায়নের জন্য দূষণনীতির প্রয়োগযোগ্যতা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় দূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত নীতিমালা বাস্তবায়ন-সফলতা-ব্যর্থতা আছে কি নেই তা তুলে ধরা হয়েছে। মূলত: দূষণ অর্থনীতি ও প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলা করার জন্য দূষণকারীর নৈতিক ভূমিকা কিরূপ হওয়া দরকার এবং ক্ষতিগ্রস্থের উপর ক্ষতিকারকদের করণীয় পদক্ষেপ ও কর্মসূচি কি হতে পারে তা প্রবন্ধে উলেখ করা হয়েছে। সবশেষে পরিবেশ উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি ও সমতায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সুপারিশ করা হয়েছে।

১. ভূমিকা (Introduction)

পরিবেশের ভৌত উপাদান মাটি, পানি, বায়ু ইত্যাদি কোনো কারণে গ্রহণযোগ্য পরিমিত পরিমাণ বা আন্তর্জাতিক মান থেকে বেশি বা কম পরিবর্তিত হয়ে মানুষ ও জীবের ক্ষতির কারণ হয়। অর্থনৈতিক ভাবে এরূপ দূষণ প্রক্রিয়া কার্যকরণ হলে তাকে দূষণ অর্থনীতি (Economics of pollution) বলে। এরূপ অর্থনৈতিক দূষণ কার্যক্রম মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট। প্রাকৃতিক কারণে দূষণ অর্থনীতি যতটুকু হয় তা প্রায় পুরোটাই প্রাকৃতিকভাবে পরিশোষণ হয়। অবশ্য অঞ্চলভেদে দূষণ অর্থনীতির সহনীয় মাত্রা ব্যবধান ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে প্রবৃদ্ধি ও সমতায়ন হয়ে থাকে। বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সৃষ্ট দূষণ অর্থনীতির মাত্রা মূলত: মনুষ্য সৃষ্টির কারণে ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উন্নয়নশীল দেশের অনেক স্থানে জীবনযাপন করা হুমকীর সম্মুখীন হয়েছে। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় বা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন যেসব বাইরের বস্তুর অংশ বা পরিবেশের নিজস্ব উপাদানের অতিরিক্ত অংশ বায়ুর সাথে মিশে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের দেহে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে, রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে, সৌন্দর্যহানি বা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে এমন সংক্রামক বস্তুগুলো বা এদের অংশকে আমরা দূষক (pollutant) বলি। দূষক দ্বারা রোগ ব্যাধি সৃষ্টি করে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করাকে দূষণ (pollution) বলে। এই দূষক ও দূষণ মিলে পরিবেশের অভারসাম্য সৃষ্টি করে। আর মনুষ্য সৃষ্ট দূষণ পরিবেশ প্রবৃদ্ধি ও সমতায়নে অভারসাম্য সৃষ্টি হচ্ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য দূষণকারীর নৈতিক ভূমিকা কিরূপ হওয়া দরকার এবং ক্ষতিগ্রস্থের উপর ক্ষতিকারকদের করণীয় পদক্ষেপ ও কর্মসূচি কি হতে পারে তা প্রবন্ধে উলে করা হয়েছে।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives)

১. দূষণ অর্থনীতি ও পরিবেশের অভারসাম্য সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান, নৈতিক অবক্ষয় ও ক্ষতিকর প্রভাব বিশেষণ।

২. দূষণের বিভিন্ন প্রকরণ বিষয়ে অবহিতকরণ এবং দূষণকারীর নৈতিক ভূমিকা, পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

৩. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীলদেশের জন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ নীতি এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ রক্ষায় প্রবৃদ্ধি ও সমতায়নের জন্য প্রয়োগযোগ্য করণীয় পদক্ষেপ ও কর্মসূ১চি গ্রহণ।

৩. দূষণের উৎস ও ক্ষতিকর প্রভাব (Sources of pollution and harmfull effects)

৩.১. দূষণের উৎস (Sources of pollution)

দূষণের উৎস মূলত প্রকৃতি প্রদত্ত, মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট, নির্গম গ্যাস ইত্যাদি। সর্বজন স্বীকৃত দূষণের উৎস মূলত: মানুষ এবং মানুষের সৃষ্ট অনৈতিক পরিস্থিতি ও কার্যক্রম। এ পর্যন্ত প্রায় ১০০ প্রকারের দুষক শনাক্ত করা হলেও সেগুলো পৃথক করা এবং স্বতন্ত্রভাবে শ্রেণিবিন্যাস করে আলোচনা করা সহজ নয়, এজন্য মোটামুটি ভাবে দূষকগুলোকে তিন ধারায় পৃথক করা যায়।

১. উৎপত্তি অনুসারে দূষক (Pollutant on the basis of origin)

(ক) প্রাকৃতিক উৎপত্তি : প্রাকৃতিক তেজষ্ক্রিয়তা, আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎপাতের ফলে নির্গত বিভিন্ন গ্যাস, মাটির বায়ুজনিত প্রভাবে উৎপন্ন পদার্থগুলো, উদ্ভিদজাত বিভিন্ন উদ্বায়ী জৈব পদার্থ, স্বতন্ত্র জৈব পদার্থগুলো পঁচনের ফলে সৃষ্ট জৈব পদার্থ, মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীর নাক থেকে নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড, দাবানল জাত কার্বন ডাই-অক্সাইড, ফুলের বিভিন্ন ধরনের পরাগরেণু থেকে পরিবেশ দূষিত হয়।

(খ) মানুষ থেকে উৎপত্তি দূষক;

(অ) উত্তাপ : তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শিল্প কারখানা থেকে উত্তাপের সৃষ্টি হয়ে মানুষের দেহের উপর প্রভাব ফেলে। **(আ) তেজষ্ক্রিয় পদার্থ :** বিভিন্ন পারমাণবিক চুলী থেকে তেজষ্ক্রিয় পদার্থ নির্গত হয়ে সব রকমের প্রাণি ও উদ্ভিদের উপর প্রভাব ফেলে। **(ই) গ্যাসীয় দুষক :** কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি জীবাশ্ম জ্বালানী পোড়াবার ফলে সৃষ্ট কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। **(ঈ) কঠিন কণিকা :** বিভিন্ন শিল্প কারখানা ও খনি থেকে সৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন কণিকাগুলো বাতাসে ভেসে বিভিন্ন প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে ক্ষতি সাধন করে।

২. প্রকৃতি ভিত্তিক দূষকের ধরণ (Pattern of pollutant on the basis of nature)

(ক) গ্যাসীয় দুষক- CO, CO_2 এবং বিভিন্ন হাইড্রো কার্বন, ফ্লুওরো কার্বন, SO_2, H_2SO_4, নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড যৌগ, বিভিন্ন অ্যালডিহাইড যৌগ গ্যাসীয় দুষক হিসেবে কাজ করে।

(খ) কণিকা ধর্মী দুষক-এরোসল, বিস্ফোরণ জাত পদার্থ, ধোঁয়া, পরাগরেণু, ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি উপাদান উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহে দূষক হিসেবে কাজ করে।

৩. নির্গমনের ভিত্তিতে দূষক (Pollutant on the basis of emission)

নির্দিষ্ট উৎস থেকে সরাসরি নির্গত হয়ে অথবা বায়ুমন্ডলের কোনো মূল পদার্থ দুষকে রূপান্তরিত হয়ে পরিবেশ দূষিত করে। যেমন,

(ক) প্রাকৃতিক দুষক-CO, CO_2, SO_2 প্রভৃতি দুষক প্রাকৃতিক ভাবে নির্গত হয়ে অথবা মানুষের কার্যাদির ফলে লাভ করে পরিবেশ দূষিত করে।

(খ) গৌণ দুষক-বায়ুমন্ডলীয় যৌগগুলোর অভ্যন্তরীণ বিক্রিয়ার প্রভাবে H_2, SO_4HNO_3 প্রভৃতি দুষক উৎপত্তি লাভ করে।

৩.২.বায়ু দূষণ (Air Pollution)

নাইট্রোজেন (৭৮.০৯%), অক্সিজেন (২০.৯৪%), কার্বন ডাই-অক্সাইড (০.৩%) ছাড়াও স্বল্প পরিমাণ আর্গন, হিলিয়াম, জেনন, ক্রিপটন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মিশ্রণে বায়ু। বায়ুর উপস্থিতির জন্যই পৃথিবীতে প্রাণি, উদ্ভিদ প্রভৃতি জীবের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। বায়ুর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বায়ুর বিশুদ্ধতা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো কারণে বায়ুতে বাইরের কোনো কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ অনুপ্রবেশ করলে এবং বায়ুর নিজস্ব উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে বায়ু দূষণ হয়। বায়ু দুষিত হলে বায়ুর স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং জীবজগৎ ও সম্পদ-সম্পত্তির উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বাইরের উপাদান ও নিজস্ব উপাদানের অতিরিক্ত পরিমাণ বায়ু থেকে দূর হয় এবং বায়ুতে ভারসাম্য নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু বাইরের উপাদানের অত্যধিক মিশ্রণ হলে বায়ুর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আশানুরূপ হয় না; ফলে পরিবেশ বিপন্ন হয়। গাড়ির কালো ধোঁয়া বায়ু পরিবেশকে দূষিত করে এবং স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

চিত্র-১ : গাড়ির কালো ধোঁয়ার মাধ্যমে বায়ু দূষণ

বায়ু দূষণের প্রধান দু'টি উৎসগত কারণ উলেখ করা যায় ।

১. **প্রাকৃতিক উৎস থেকে বায়ু দূষণ** (Air pollution from natural sources) **:** আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, বনভূমিতে অগ্নিকান্ড (দাবানল), মাটি, সমুদ্র, পচনশীল প্রাণী ও উদ্ভিদের আধিক্য, ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রভৃতি বায়ু দূষণের প্রাকৃতিক উৎস । আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সালফার অক্সাইড (SO_2) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন কণা নির্গত হয়ে বাতাসে মিশে যায় । বনভূমিতে দাবানল সৃষ্টির ফলে কার্বন মনোঅক্সাইড (CO), কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_2) এবং পোড়া কাঠের কণা বাতাসে মিশে যায় । মাটির ভাইরাস ও ধূলিকণা, সমুদ্রের লবণকণা, মিথাইল ক্লোরাইড (CH_3, Cl), মিথাইল ব্রোমাইড (CH_3Br) এবং মিথাইল আয়োডাইড (CH_3I), জীবিত উদ্ভিদ থেকে পরাগরেণু, হাইড্রোকার্বন, ছত্রাক, স্পের, চুল, ফেদার প্রভৃতি, পঁচনশীল মৃত উদ্ভিদ থেকে মিথেন (CH_4), হাইড্রোজেন সাইফাইড (H_2S), ঝড়-ঝঞ্জা থেকে ধূলিকণা বায়ুর সাথে মিশে বায়ুকে দূষিত করে ।

২. **মানব সৃষ্ট উৎস থেকে বায়ু দূষণ** (Air pollution from man made sources) : মানুষ নিজেই দুষক হিসাবে কাজ করে । মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে বায়ুদূষণকে মনুষ্য সৃষ্ট বায়ু দূষক (authropogenic air pollution) বলে । মনুষ্য সৃষ্ট উৎস দুই প্রকারের হয় ।

(i) স্থির উৎস (Static sources) **:** তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র, শিল্প-কারখানা, রিফ্রিজারেটর, আবর্জনা পোড়ান, কাঠ পোড়ান, প্রভৃতি দূষণের স্থির উৎস । তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে SO_x, NO_x, CO, CO_2 কয়লা কণা, ধোঁয়া, ছাইকণা প্রভৃতি, নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে Sr-90, Cs-137, C-14 প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় গ্যাস, আয়োডিন-১৩১, আরগণ-৪১, রেডন প্রভৃতি ফ্লুরাইড; বিভিন্ন প্রকার কারখানা থেকে CO, SD_x, NO_x, হাইড্রোকার্বন, H_2S, NH_3, বা?, গন্ধ, ধূলিকণা, ধোঁয়া, শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্য প্রক্রিয়া করণের সময় CO, SO_x, NO_x, NH_3, জৈব ফসফেট, ধূলিকণা, বা?, অ্যাজবেষ্টাস, কুয়াশা, কৃষিজাত দ্রব্য প্রক্রিয়া করণের সময় SO_x, ক্লোরিনেটেড হাইড্রো কার্বন, ধোঁয়া, ধূলিকণা, বা?কণা, রেফ্রিজারেটর মেরামতের সময় ক্লোরোফ্লুরোকার্বন, ক্লোরিন, ব্রোমিন; পৌর প্রতিষ্ঠানের আবর্জনা পোড়াবার সময় CO, CO_2, SO_y, NO, NO_3 জৈব ফসফেট, ধোঁয়া, বা?কণা, গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত কাঠ, কয়লা, কেরোসিন, গ্যাস প্রভৃতি পোড়াবার সময় CO_2, CO, H_2S ধোঁয়া নির্গত হয়ে বায়ু দূষিত করে ।

(ii) সচল উৎস (Mobile sources) : সব ধরনের পরিবহণ মাধ্যমগুলো বায়ুদূষণের প্রধান উৎস । সড়ক পরিবহণে ব্যবহৃত বাস, ট্রাক, কার, CNG চালিত অটোরিক্সা, বেবী ট্যাক্সি প্রভৃতি; রেলপথে পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত যাত্রীবাহী

রেলগাড়ি, মালবাহী রেল গাড়ি, পানিপথে পরিবহণের ব্যবহৃত ষ্টীমার, লঞ্চ, জাহাজ, ইঞ্জিনচালিত নৌযান, আকাশ পথে পরিবহণে ব্যবহৃত হেলিকপ্টার, উড়োজাহাজ, কংকর্ড প্রভৃতিতে ব্যবহৃত জ্বালানী থেকে CO, CO_2, H_2S, SO_x, NO_x হাইড্রো কার্বন পারদ, সীসা ধোঁয়া প্রভৃতি নির্গত হয়ে বায়ু দূষিত করে।

কিভাবে বায়ু দূষণ হয়?

বায়ু দূষণ প্রক্রিয়া অনেকটা পর্যায়গতভাবে হয়।

(ক) প্রাথমিক বায়ু দূষক (Primary air pollutions) : প্রাকৃতিক উৎস এবং মানুষের সৃষ্ট উৎস থেকে সরাসরি বায়ু দূষিত হওয়াকে প্রাথমিক বায়ু দূষক বলে। CO, CO_2, SO_x, NO_x ধোঁয়া, ধূলিকণা, ভাইরাস, পরমাণু, ফ্লাই-অ্যানা প্রভৃতি প্রাথমিক দূষকের অন্তর্গত।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়ের বায়ু দূষক (Secondary air pollutions) : প্রাথমিক বায়ু দূষক থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের দুষকগুলো উৎপত্তি লাভ করে। সৌর আলোকের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ফলে বায়ুতে একাধিক প্রাথমিক বায়ু দূষকের পারস্পরিক বিক্রিয়ায়, অথবা প্রাথমিক দূষকগুলোর সাথে বায়ুর স্বাভাবিক উপাদানের বিক্রিয়া অথবা বায়ুর স্বাভাবিক উপাদানের বিক্রিয়ায় অথবা বায়ুর স্বাভাবিক উপাদানের দুটি উপাদানের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন নতুন প্রকৃতির দূষককে দ্বিতীয় পর্যায়ের বায়ু দূষক বলে। উৎপাদকের প্রাথমিক বায়ু দূষকের তুলনায় দ্বিতীয় পর্যায়ের বায়ু দূষকগুলো অনেক বেশি ক্ষতিসাধন করে। ওজোন, সালফিউরিক অ্যাসিড, ধোয়াশা, পার অক্সি অ্যাসাইল নাইট্রেট (PAN) প্রভৃতি দ্বিতীয় পর্যায়ের বায়ু দূষক।

আবার বায়ু দূষকগুলোকে সজীব বায়ু দূষক এবং অজীব বায়ুদূষক নামে উলেখ করা হয়। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পরাগরেণু প্রভৃতি যে সব দূষকের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে সেগুলোকে সজীব বায়ু দূষক (Biotic air pollutant) বলে। কিন্তু যে সব বায়ু দূষকের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব নেই সেগুলোকে অজীব বায়ু দূষক (Abiotic air pollution) বলে। CO, CO_2 প্রভৃতি কার্বন যৌগ, অক্সিজেন যৌগ (O), SO_2, SO_3, H_2S মারক্যাপট্যান প্রভৃতি সালফার যৌগ; NO, NO_2, NO_3, NH_3, N_2O প্রভৃতি নাইট্রোজেন যৌগ; HF, HCl প্রভৃতি হাইড্রোজেন যৌগ, হাইড্রোকার্বন HCHO প্রভৃতি জৈব যৌগ, Sr-90, Cs-134, C-14 প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় গ্যাস যৌগ, আলোক রাসায়নিক জারক প্রভৃতি গ্যাস ও বা?জাতীয় দূষক। এছাড়া এ্যারোসল একটি উলেখযোগ্য অজীব দূষক।

বায়ু নিসরণ এর মাধ্যমে আণুবিক্ষণিক মাইক্রণ থেকে ১০০ মাইক্রণ পর্যন্ত কঠিন বা তরল সিরণ দশায় আঠালো পদার্থকে অ্যারোসল (Aerosol) বলে। জৈব ও অজৈব পদার্থের ঘর্ষণের মাধ্যমে অথবা চূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে ধুলিকণা (dust) উৎপন্ন হয়। ১ থেকে ২০০ মাইক্রণ বিশিষ্ট ফ্লাইঅ্যাশ ৫০ থেকে ১৫০ মাইক্রণ বিশিষ্ট সিমেন্ট কণা এই জাতীয় বিভিন্ন দাহ্য বস্তুর অসম্পূর্ণ দহনের ফলে উৎপন্ন অতি সূক্ষ্ম কণার বায়ু নিঃসরণে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। ০.০১ থেকে ০.২ মাইক্রণের কয়লার ধোঁয়া কণা, ০.০১ থেকে ১.০ মাইক্রণের তেলের ধোঁয়াকণা ধোঁয়ার অন্তর্গত। অপেক্ষাকৃত বড় আয়তনের তরল কণার লঘু বায়ু বিসরণে হালকা কুয়াশা (mist) উৎপন্ন হয়। জলীয় বা? থেকে প্রাকৃতিক হালকা কুয়াশা উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে তরল বা কঠিন কণার বায়ু নিরসণে সৃষ্ট অ্যারোসলকে ঘন কুয়াশা (fog) বলে। ১ থেকে ৪০ মাইক্রণ বিশিষ্ট পানিকণা বা বরফকণা ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুতে ভাসমান অবস্থায় থাকলে তাকে ঘন কুয়াশা বা ফগ বলে।

কার্বন সমৃদ্ধ জীবাশ্ম জ্বালানীর অসম্পূর্ণ দহনে কার্বন মনো অক্সাইড (CO) গ্যাস উৎপন্ন হয়। মোটর যান থেকে নির্গত গ্যাস, বৈদ্যুতিক এবং বাস্ট ফার্নেস থেকে নিসৃত গ্যাস, পেট্রোলিয়াম পরিশোধন জোনিত্র থেকে নিসৃত গ্যাস, কয়লা পানি থেকে নিসৃত গ্যাস, গ্যাস তৈরির জোনিত্র থেকে নিসৃত গ্যাস এই শ্রেণির অন্তর্গত।

গন্ধক (সালফার) যুক্ত কয়লা, সালফারযুক্ত গ্যাস এবং হাইড্রোকার্বন তেলের দহনের ফলে সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2) এবং সালফার ট্রাই অক্সাইড (SO_3) উৎপন্ন হয়। তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, মোটর যান থেকে নিসৃত গ্যাস, ধাতু সংক্রান্ত (zn, Cu, Ph) ক্রিয়া প্রণালীতে নিসৃত গ্যাস, সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন জোনিত্র থেকে নিসৃত গ্যাস, কাগজ তৈরি জোনিত্র থেকে নিসৃত গ্যাস এই জাতীয়।

অবায়ুবীয় জীবের পচন, সমুদ্র, আগ্নেয়গিরি, প্রাকৃতিক ঝর্ণা, মল জোনিত্র, পেট্রোলিয়াম শোধনাগার, কোক কয়লা চুল্লী জোনিত্র, রেওন জোনিত্র প্রভৃতি থেকে পচা ডিমের মত দূর্গন্ধ যুক্ত গ্যাস হাইড্রোজেন সালফার (H_2S) নামে পরিচিত। H_2S ব্যতীত মিথাইল ম্যাগক্যাপটান (CH_2SH), ডাই মিথাইল সালফাইড (CH_3SCH_3) এবং ডাই মিথাইল ডাই সালফাইড ($CH_3SS\,CH_3$) প্রভৃতি দূর্গন্ধ যুক্ত সালফার দূষক বায়ু দূষণ করে।

বায়ুদূষণকারী নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাসগুলোর মধ্যে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO_2) এবং ট্রাই-অক্সাইড (NO_3) অন্যতম। স্বয়ংক্রীয় মোটরযান থেকে নিসৃত গ্যাস, শক্তি উৎপাদক জোনিত্র, ফার্নেস এবং হিট বার্নার থেকে নিসৃত গ্যাস, নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী জোনিত্র থেকে এ জাতীয় গ্যাস নিসৃত হয়।

বায়ু দূষণকারী ক্লোরিন (Cl_2) এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) সিউয়েজ জোনিত্র, সাতার প্রশিক্ষণ ছোট জলাশয় পানি বিশোধন জোনিত্র এবং ক্লোরিন উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী জোনিত্র থেকে ক্লোরিন গ্যাস নিঃসৃত হয় এবং রাসায়নিক শিল্প থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস নিসৃত হয়ে বায়ুর সাথে মিশে।

ওজোন (O_3) একটি বিষাক্ত ও গন্ধযুক্ত গ্যাস। প্রধানত দহনের ফলে উৎপন্ন নাইট্রেজেন ডাই-অক্সাইড এবং সূর্যালোকের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওজোন গ্যাসের সৃষ্টি হয়। ফরম্যাল ডিহাইড (HCHO) থেকে বায়ু দুষণকারী অ্যালডিহাইক (-CHO) গ্যাস উৎপন্ন হয়। গ্যাসোলিন, ডিজেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পিচ্ছিল কারন তেল ও মোটর গাড়ির জ্বালানির অসম্পূর্ণ দহন এবং দিনের বেলায় বায়ুতে আলোকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হয়।

বায়ু দূষণের প্রভাব (Effects of air pollution)

বায়ু দূষণের প্রভাবকে (ক) জীবের উপর প্রভাব এবং (খ) অজীব বস্তুর উপর এ নামে দু'ভাবে উলেখ করা যায়। জৈবিক প্রভাবকে (Biological effects) আবার (অ) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব, (আ) প্রাণীর উপর প্রভাব এবং (ই) উদ্ভিদের উপর প্রভাব এই তিন ধরনের উলেখ করা যায়।

(অ) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বায়ু দূষণের প্রভাব (Effect on human health) : এরূপ প্রভাব মূলত: তিন ধরনের হয়।

১. মানুষের উপর বায়ু দূষণের বিপদ শঙ্কুল প্রকট (Expousure on human health by air pollution)

(i) শ্বসন জনিত প্রকট (Exposure) : মানুষ যখন প্রশ্বাস গ্রহণ করে তখন বায়ুর সাথে দূষক গ্যাস, ক্ষুদ্র কণা, ধূলা, পরাগরেণু, ছত্রাক প্রভৃতি দুষক নাক শ্বাসনালীর মধ্য দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে স্থায়িভাবে অবস্থান নেয় এবং ক্রমে রক্ত ও অন্যান্য কোষে প্রবেশ করে মানুষের দেহের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া শরীরের উপর দেখা যায়। এতে স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাবের কারণে নানা ধরনের রোগের সৃষ্টি করে।

(ii) অঘ্রাণজনিত প্রকট (Nonsmelling expousure) : দূষক গ্যাস, গন্ধ সৃষ্টিকারী কণা ও উদ্বায়ী পদার্থ (fame) নাকের শেস্মা আবরণীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে দেহের ক্ষতি সাধন করে এবং রোগী শেস্মাজনিত উপসর্গে আক্রান্ত হয়।

(iii) সংস্পর্শ জনিত প্রকট (Contactional exposure) : দেহের অনাবৃত অংশের ত্বক, মুখমন্ডল, ঠোঁট ও চোখ বায়ু দূষকের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে ত্বক জনিত রোগে আক্রান্ত হয়।

২. বায়ু দূষণের কাজের প্রক্রিয়া (Working process of air pollutant) : কোষীয় স্তরে বায়ুদূষক তিনটি প্রক্রিয়ায় কাজ করে।

(i) এনজাইম (Enzyme) সক্রিয়তা পরিবর্তন করে : কোষের রাসায়নিক বিক্রিয়া সৃষ্টিকারী সানবদেহে প্রবেশ করে স্বাভাবিক সক্রিয়তা পরিবর্তন করে বায়ুদূষক কলাকোষের স্বাভাবিক কাজে বাধা সৃষ্টি করে।

(ii) কোষের অণুর সাথে যুক্ত হয়ে : কোষের অণুর সাথে কিছু দূষক যুক্ত হয়ে দেহের রাসায়নিক ভারসাম্যে বাধার সৃষ্টি করে। যেমন, কার্বন মনোক্সাইড (CO) লাল রক্ত কণিকার রঞ্জক উপাদান হিমোগ্লোবিনের (Hemoglobin) সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিজেন পরিবহণে বাধার সৃষ্টি করে।

(iii) ক্ষতিকারক রাসায়নিক বস্তু নিঃসরণ করে : কয়েকটি বিশেষ ধরনের বায়ু দূষক কোষে খারাপ প্রভাব সৃষ্টিকারী রাসায়নিক বস্তু নিঃসরণ করে। যেমন, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড বিশেষ নার্ভের কোষকে উদ্দীপিত করে, এপিনেফ্রিন নিঃসরণ ঘটায়। এপিনেফ্রিন বেশি পরিমাণে নিঃসরণ হলে যকৃত কোষ (hapaic cyst) নষ্ট করে।

৩. বায়ু দূষকের বিষক্রিয়ার প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামক (Factros, affecting toxicity of pollutant)

বায়ু দুষকের বিষক্রিয়ায় প্রভাবিত করে এমন নিয়ামকগুলো হচ্ছে,

(i) ঘনত্ব ও ক্রিয়াকাল : বায়ুতে উপস্থিত দূষকের ঘনত্ব ও দূষকের প্রকট কালের স্থায়িত্ব মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বায়ু দূষকের প্রভাব নির্ভর করে।

(ii) দূষকের প্রকৃতি : দূষকের রাসায়নিক প্রকৃতির উপর দূষণের প্রভাব মাত্রা নির্ভর করে।

(iii) দূষকের জীব-সক্রিয়তা : কোষের উৎসেচকের **(enzyme)** সাথে বায়ু দূষকের রাসায়নিক সংবেদনশীলতাকে জীব-সক্রিয়তা বলে, অধিক জীব সক্রিয়তা দুষকগুলো বেশি ক্ষতি সাধন করে।

(iv) মানুষের বয়স ও লিঙ্গ : মানুষের বয়সের উপর দূষণ জনিত প্রভাবের মাত্রা নির্ভর করে। পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তির তুলনায় শিশু ও কিশোরদের উপর বায়ু দুষক অধিক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে। আবার পুরুষদের তুলনায় মহিলারা বায়ু দূষক দ্বারা অধিকমাত্রায় প্রভাবিত হয়। ওজোন (O_3) এবং সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2) গ্যাস পূর্ণ বয়স্কদের তুলনায় শিশুদের উপর ২ থেকে ৩ গুণ এবং পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের উপর দ্বিগুণ খারাপ প্রভাব বিস্তার করে।

(v) স্বাস্থ্যের অবস্থা : পুষ্টির অভাব, যে কোনো নেশা করা, ধুমপান, হৃৎপিন্ড ও ফুসফুসের রোগ, প্রভৃতি মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করে। খারাপ স্বাস্থ্য সম্পন্ন মানুষের উপর বায়ু দূষকগুলো সহজে ও দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে। ধুমপান এক ধরনের বায়ু

দূষণ, এর ফলে ফুসফুসে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

(vi) **পেশাগত প্রকট :** শ্রমজীবী মানুষ পেশাগত কারণে কর্মস্থলে বায়ু দূষক দ্বারা অধিক মাত্রায় আক্রান্ত হয়।

(vii) **যৌথ ক্রিয়া :** একাধিক বায়ু দূষক একই সময়ে একই ব্যক্তির উপর প্রভাব ফেললে বিষক্রিয়ার মাত্রা বৃদ্ধি হয়।

(viii) **বিরোধিতা :** এক ধরনের বায়ু দূষক দ্বারা প্রভাবিত কোনো একটি এলাকায় নতুন কোনো ভিন্ন ধর্মী বায়ু দূষক উপস্থিত হলে আগের বায়ু দূষকের মন্দ প্রভাব হ্রাস পায়।

(আ) প্রাণির উপর বায়ু দূষণের প্রভাব (Effect of air pollution on Animal)

বিভিন্ন বায়ু দূষণের প্রাসঙ্গিক ঘটনা বা উপাখ্যান (episode) এর ফলে পালিত ও বন্য প্রাণির উপর বায়ু দূষণের বিরূপ প্রভাবের তথ্য পাওয়া গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাষ্ট্রের ডোনোযা উপখ্যানের (১৯৪৮) কারণে ১৫ শতাংশ গৃহপালিত কুকুর আক্রান্ত হয়। পেজা রিকা উপাখ্যান (১৯৫০ খ্রি:) হাইড্রোজেন সাইক্রাইডের দ্বারা অসংখ্য গবাদি পশু, শূকর, কুকুর এবং মুরগী মারা যায়। লন্ডন উপখ্যানে (১৯৫২ খ্রি) ৫টি গবাদি পশু মারা যায় এবং ৫২টি গবাদি পশু মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ স্বাধীনতাপূর্ব অতি শীত প্রধান এলাকায় এবং বন্যা কবলিত এলাকায় বারংবার গুরুত্ব, ছাগল, ভেড়া, হ্রাস মুরগির উপর এরূপ প্রভাব লক্ষ্য করার মত ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বন্যাকবলিত এলাকায় এরূপ প্রভাবের কারণে অনেক পশু ও হাঁস-মুরগি মারা যায়। তাছাড়া দেশের পশ্চিমাঞ্চল, পশ্চিম দক্ষিণ অঞ্চলে পশুর উপর এরূপ প্রভাব ২০০৪-০৫ সালেও দেখা গিয়েছে।

(ক) বায়ু দূষক দ্বারা প্রাণি আক্রান্ত হবার প্রকরণ (Effecting pattern of air pullutant on animal)

১. **ক্ষণস্থায়ি প্রভাব :** বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, ধাতু নিষ্কাশন কারখানা, বয়লার এবং স্বয়ংক্রিয় যানবাহন থেকে নিঃসৃত ধোঁয়া থেকে প্রত্যক্ষভাবে প্রাণির উপর ক্ষণস্থায়ি প্রভাব পড়ে।

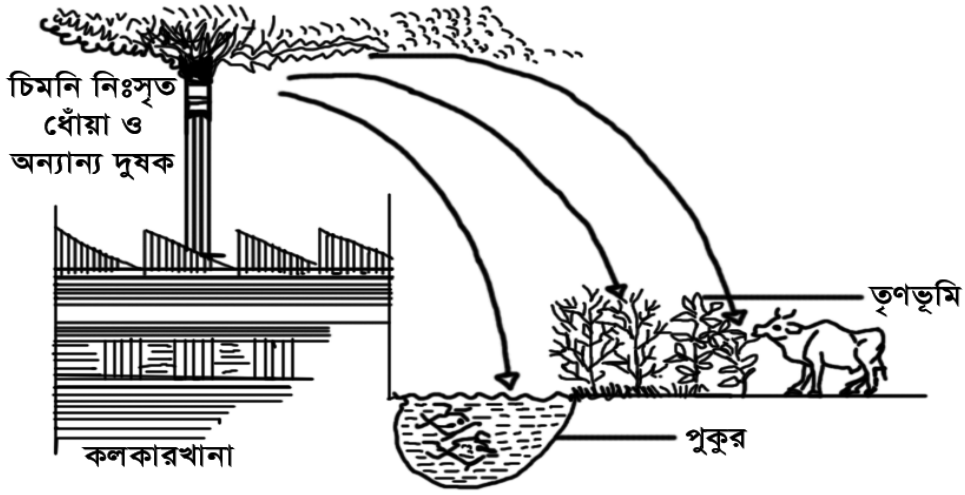

চিত্র-২ : প্রাণির উপর বায়ু দূষকের প্রভাব

২. **দীর্ঘস্থায়ি প্রভাব :** নির্গত বায়ু দূষক ক্রমে উদ্ভিদের পাতা এবং গবাদি পশুর খাদ্য উপাদানের উপর সঞ্চিত হয়। সংক্রামিত দূষিত খাদ্য আহার করে বিভিন্ন প্রাণি পরোক্ষভাবে দূষক দ্বারা আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন এলাকায় যেমন গাজীপুর, সাভার, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ এলাকায় যে কারখানা থেকে নিঃসৃত ধোঁয়া ও দূষক দ্বারা বন্য পশু পাখি মারা যেতে দেখা যায়। আবার পাঁখি হাঁস, মুরগির উপর এরূপ মরণ লাগা পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

(খ) প্রাণির উপর বায়ু দূষকের প্রভাব (Effect of air pollutant on animal)

মানুষ সহ সব ধরনের প্রাণি বায়ু দূষকগুলো দ্বারা মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত হয়। ফ্লুরাইড, আর্সেনিক, সীসা, মলিবডেনাম এবং ওজোন প্রাণির উপর ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিকারী সংক্রামক গুলোর মধ্যে অন্যতম।

- **সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড :** সালফার অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড থেকে উৎপন্ন সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড বন্য প্রাণির বৃদ্ধি, বিকাশ ও বংশ বিস্তারে বাধার সৃষ্টি করে; বিশেষ করে মাছের উপর এই অ্যাসিডে দ্বয়ের প্রভাব অনেক বেশি।

- **ওজোন :** বায়ুতে ওজোন গ্যাসে সংক্রমণের ফলে কুকুর, বিড়াল ও খরগোসের ফুসফুসের বর্ণ পরিবর্তন হয়, ফুসফুস স্ফীত হয় এবং রক্ত ক্ষরণ হয় ।
- **ফ্লুরাইড :** ধাতু নিষ্কাশনের কারখানা থেকে উৎপন্ন ফ্লুরাইড বায়ুর মাধ্যমে উদ্ভিদ খাদ্য উৎসের সংস্পর্শে আসে । ফ্লুরাইড সংক্রমিত উদ্ভিদ খাদ্য আহার করে গবাদিপশু ফ্লুরাইড সংগ্রহ করে ।
- **আর্সেনিক :** কয়লা ও ধাতব আকরিকের সাথে অশুদ্ধ আর্সেনিক থাকে । ধাতব নিষ্কাশন ও তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিমনি নিঃসৃত আর্সেনিক কণা বায়ু প্রবাহের সাথে বিস্তৃর্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে । উদ্ভিদের উপর অধঃক্ষেপিত আর্সেনিক গবাদি পশুর উপর ক্ষণস্থায়ি ও দীর্ঘস্থায়ি বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে ।
- **সীসা :** ধাতব নিষ্কাশন, কোক চুল্লী ও কয়লার দহনে সীসা বায়ুতে সংক্রমিত হয় । আবার সীসা আর্সেনিক যুক্ত পাউডার এবং স্প্রে মেশিন থেকে সীসা বায়ুতে সংক্রমিত হয় । বায়ুতে মিশ্রিত সীসা প্রাণির উপর ক্ষণস্থায়ি ও দীর্ঘস্থায়ি বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে ।
- **স্থুলানু বিকিরণ :** বায়ুমন্ডলে নিউক্রিয়ার বোমা বা পারমাণবিক বোমা বায়ুমন্ডলে বিস্ফোরণের ফলে যে আয়োনাইজিং রেডিয়েশন বা স্থুলাণু বিকিরণ হয় জীবজন্তুর উপর তার বিষক্রিয়া পড়ে । বিস্ফোরণের সন্নিহিত স্থানে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত মানুষসহ সব ধরনের প্রাণি ও উদ্ভিদের মৃত্যু হয় ।

(ই) উদ্ভিদের উপর বায়ু দূষণের প্রভাব (Effect of air pollution on plants)

বায়ু দূষণ উদ্ভিদের বৃদ্ধি, বিকাশ ও বংশ বিস্তারের উপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করে । বায়ুর সাথে মিশ্রিত সালফার ডাই-অক্সাইড, ফ্লুরিন যৌগ এবং ধোঁয়াশা মিশ্রিত থাকে । এই তিনটি উদ্ভিদ দূষক ছাড়াও ওজোন, পার অক্সিজেন অ্যাসাইল নাইট্রেট (PAN), ফরমাল ডিহাইড, ক্লোরিন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন-সালফাইড এবং ইথিলিন উদ্ভিদের ক্ষতি করে ।

উদ্ভিদ-স্বাস্থ্যের উপর বায়ু দূষণের প্রভাব (Effect of air pollutant on botanical health)

১. **সালফার ডাই-অক্সাইড :** এটি একটি অতি পরিচিত বায়ু দূষক বিষ । অধিক ঘনত্বের এই গ্যাস বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে । কম ঘনত্বের এই গ্যাস দীর্ঘস্থায়ি প্রভাব ফেলে ।

২. **হাইড্রোজেন ক্লোরাইড :** এর সংস্পর্শ উদ্ভিদের উপর প্রভাব ফেলে । ঘনীভূত ক্লোরাইড গ্যাস উদ্ভিদের পাতায় ও কণায় বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে ।

৩. **ধোঁয়াশার প্রভাবঃ** ধোঁয়াশার সাথে ওজোন পার অক্সি অ্যাসাইল নাইট্রেট (PAN) এবং আলোক রাসায়নিক জারক থাকলে উদ্ভিদের প্রাক পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তি হয় এবং উদ্ভিদ দ্রুত বেড়ে উঠে ।

৪. **উদ্ভিদের উপর অন্যান্য বায়ুবীয় দূষকের প্রভাব :** ক্লোরিন গ্যাস, অ্যামেনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং ইথিলিন উদ্ভিদের ক্ষতি সাধন করে । সালফার ডাই-অক্সাইড অপেক্ষা ক্লোরিন তিনগুণ বেশি বিষক্রিয়া ঘটায় । অ্যামেনিয়া টমাটো গাছের ক্ষতি করে । হাইড্রোজেন সালফাইড অতি উচ্চ মাত্রায় মূলা, কুমড়ো প্রভৃতি উদ্ভিদের এবং সয়াবিনের ক্ষতি করে । ইথিলিনের প্রভাবে এপিন্যাস্টি বক্রতা, ক্লোরোসিস এবং পত্র মোচন প্রভৃতি দেখা দেয় ।

আলোক-রাসায়নিক বায়ু দূষণ ও ইহার প্রভাব (Photo-Chemical air pollution and it effect)

ধোঁয়ার (smake) সাথে কুয়াশা (fog) মিশ্রিত হয়ে ধোঁয়াশার (smag) সৃষ্টি হয় । হাইড্রোকার্বন এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডের আলোক-রাসায়নিক জারণে আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশার উদ্ভব হয় । এর সাথে ওজোন, ফম্যালডিহাইড, অ্যাক্রোলিন, পার অক্সাইড, পার অক্সি অ্যামাইল নাইট্রেট (PAN), নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড এবং মুক্ত ব্যাডিকল সংযুক্ত হয়ে ধোঁয়াশাকে মারাত্মক বিষপূর্ণ গ্যাসে পরিণত করে ।

(ক) মানুষের উপর আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশার প্রভাব পড়ে (Effect of photo chemical smog on man)

১. ধোঁয়াশার অ্যাক্রোলিন এবং ফরম্যাল ডিহাইড প্রভৃতি যৌগ চোখে জ্বালা ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করে ।

২. ধোঁয়া ও অ্যারোসলের সমন্বয়ে ধোঁয়াশা মিশ্রিত বায়ু মানুষের দৃষ্টি শক্তি হ্রাস করে ।

(খ) উদ্ভিদের উপর আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশার প্রভাব পড়ে (Effect of photo chemical smog on plants)

ওজোন, প্যান (PAN) এবং নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড পরিচিত ফাইটোটকিক্সকাস্ট। এগুলোর প্রভাবে উদ্ভিদের ক্লোরোসিস (Chlorosis), নেক্রোসিস (Necrosis) এবং বৃদ্ধি হ্রাস প্রভৃতি রোগ হয়।

৩.৩ পানি দূষণ (Water Pollution)

উদ্ভিদ ও প্রাণির উপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টিকারী পানির যে কোনো ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনকে পানি দূষণ বলে। পানি দূষণ স্বল্প পরিসরে এবং বিশ্বব্যাপি হতে পারে। স্বল্প পরিসর স্থানে পানি দূষিত হলে তা সহজে নিবারণ করা সম্ভব, কিন্তু বিশ্বব্যাপি পানি দূষিত হলে তা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কষ্টকর। বিভিন্ন দেশের পানি দূষণে সংক্রামিত হলেও দেশ ভেদে দূষণের প্রকৃতি নির্ভর করে সে সব দেশের উন্নয়নের স্তরের উপর। দরিদ্র দেশের অধিকাংশ মানুষ কম শিক্ষিত এবং পানি দূষণ সম্বন্ধে তাদের তেমন কোনো ধারণা নেই। ফলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির বর্জ্য বস্তু, বর্জ্য বস্তুর রোগ জীবাণু এবং অদক্ষ খামার এবং কঠোর কাজে উৎপন্ন তলানি বা গাদ প্রভৃতি পানির সাথে মিশে পানি দূষিত করে। বাংলাদেশের বুড়িগঙ্গা নদী, ঢাকার চারপার্শ্বে খাল, বিল, নদীগুলো মানুষ সৃষ্ট দূষণের ফলে এসবের পানি নষ্ট হয়েছে এবং অধুনা ব্যবহার উপযোগি নয়। এমন কি নদী পারাপার এর সময় মানুষ নাক-মুখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস নিয়ে থাকে। নদী পাড়ের মানুষ পানি দূষণের কারণ এখন আর তারা সুস্থ নয়। পক্ষান্তরে উন্নত ও বৃত্তশালী দেশগুলোতে পানি এরূপে দূষিত হয় না। সেখানে তাপ, বিষাক্ত ধাতু, অ্যাসিড, পেষ্টিসাইড এবং জৈব রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি অতিরিক্ত বিপজ্জনক দূষক পানির দূষণ সৃষ্টি করে।

চিত্র-৩ : কলকারখার থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থ দ্বারা পানি দূষণ

(ক) পানির দূষক (Water pollutant)

পানিকে দূষিত করে এমনসব পদার্থ ও রোগ-জীবানু পানির দূষক হিসাবে কাজ করে। জৈব পরিপোষক রোগ জীবাণু, বিষাক্ত জৈব পদার্থ, বিষাক্ত অজৈব পদার্থ, তলানি এবং উত্তাপ পানির প্রধান দূষক। যেমন,

১. মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির বর্জ্য পদার্থ, লিটার, তলানি প্রভৃতি জৈব পরিপোষক।

২. নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ডিটারজেন্ট প্রভৃতি অজৈব পরিপোষক।

৩. রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া, প্যারাসাইট প্রভৃতি রোগ জীবাণু।

৪. পেষ্টিসাইড, পলিক্লোরিনেটের বাই ফিনাইল (PCB), পলি সাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (PAH), পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি বিষাক্ত জৈব দূষক।

৫. পারদ, সীসা, তামা, ক্যাডমিয়াম, ক্রেমিয়াম, আর্সেনিক, নাইট্রেট, নাইট্রাইট প্রভৃতি ধাতু ও লবণ বিষাক্ত অজৈব পদার্থ।

মানুষই পানির দূষক হিসাবে কাজ করে এবং মানুষই দূষকের প্রধান উৎস : মানুষই পানি দূষণের প্রধান উৎস। কোনো একটি দেশে উৎপন্ন পানি দূষক কাছের বা দূরের অন্য একটি দেশের পানি দূষিত বা সংক্রামিত করতে পারে। মানুষের তৈরি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে নির্গত দূষকগুলো পানির সাথে মিশে পানি দূষিত করে। যেমন,

১. চামড়া কারখানা থেকে নির্গত টারটারিক অ্যাসিড ট্যানারী থেকে নির্গত সালফাইড, ক্রোমিয়াম, ফেনল, ট্যানিক অ্যাসিড।

২. সিরামিক জোনিত্র থেকে নির্গত ফ্লুরাইড, রঙ কারখানা থেকে নির্গত সীসা ।
৩. বস্ত্র কারখানা থেকে নির্গত খনিক এ্যাসিড, বেড়ি তেল গ্রিজ ।
৪. কাগজের কল থেকে নির্গত মুক্ত ক্লোরিন ।
৫. রাবার প্রক্রিয়া করণের সময় নির্গত ডিস্ক ।
৬. ব্যাটারি তৈরির কারখানা থেকে নির্গত সীসা, খনিজ অ্যাসিড ।
৭. অ্যাসিটেট রেওন সংস্থা থেকে নির্গত অ্যাসিটিক অ্যাসিড ।
৮. ডিসকোজরেওন সংস্থা থেকে নির্গত ডিস্ক, সালফাইড, রাসায়নিক সার কারখানা থেকে নির্গত ফ্লুরাইড, ফসফেট ।
৯. কিউপ্রামেনিয়াম রেওন সংস্থা থেকে নির্গত দস্তা ।
১০. লন্ড্রি থেকে নির্গত ক্ষার, ক্লোরিন, তেল, চর্বি ও গ্রিড ।
১১. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় নির্গত শ্বেতসার ।
১২. দুগ্ধখামার (ডেয়ারি) থেকে নির্গত চিনি (সুগার) ।
১৩. ফটোগ্রাফী থেকে নির্গত রূপা (সিলভার) ।
১৪. পারমাণবিক জোনিত্র থেকে নির্গত ফ্লুরাইড ।
১৫. তেল শোধনাগার থেকে নির্গত ম্যারক্যাপটান এবং
১৬. হালকা পানিয় তৈরির কারখানা থেকে নির্গত সাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি পানি দূষিত করে ।

(খ) আন্ত মাধ্যমে পানি সংক্রমণ (Water contamination through intermedia)

একটি মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে দূষিত পদার্থ পরিচালিত হয়ে পানি দূষিত করে । যেমন,

১. বায়ুমন্ডলে ভাসমান ধুলিকণা, অ্যাজবেস্টস কণা, পেস্টিসাইড, লবণ, তেল, লিটার, ভারীধাতু, রাসায়নিক সারের কণা প্রভৃতি বৃষ্টির পানির মাধ্যমে পুকুর,হ্রদ, নদী ও সমুদ্রের পানির সাথে মিলিত হয়ে ঐ সব পানি দূষিত করে ।
২. পুকুর, হ্রদে এবং স্থলভাগে স্তুপীকৃত বিষাক্ত জৈব পদার্থ বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমন্ডলে মিশে । এই বিষাক্ত বায়ু বৃষ্টির পানির সাথে নেমে এসে আবার পুকুর,হ্রদ, নদী ও সাগরের পানিতে এবং স্থলভাগে এসে পড়ে । স্থলভাগে পতিত দূষিত বৃষ্টির পানির কিছু অংশ পৃষ্ঠ পানি সরণ আকারে প্রবাহিত হয়ে পুকুর, খাল ও নদীতে এসে পড়ে এবং কিছু অংশ চোয়ান প্রক্রিয়ায় মাটির রন্ধ্র পথের মধ্য দিয়ে গভীরে ভৌত পানি দূষিত করে ।
৩. কৃষি জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক দ্রব্যগুলো পানির সাথে মিশে ক্ষয়ে যাওয়া মাটির সাথে ক্রমে পুকুর, হ্রদ, নদীতে ও পরে সমুদ্রে এসে পতিত হয় ।
৪. মাটির নিচে যে সব বর্জ্য পদার্থ পুতে রাখা হয় তা থেকে তরল অংশ বেরিয়ে গভীর, অগভীর ভৌত পানি দূষিত করে এবং মাটির মধ্য দিয়ে ঢালু অনুসারে অগ্রসর হয়ে কূপ, পুকুর ও ঝরণার পানি সংক্রমিত হয়ে পানিকে দূষিত করে ।

(গ) পানি দূষণের নিয়ামক (Factors of water pollution)

পানির গভীরতা, পানির পরিমাণ, পানির তাপমাত্রা, আন্তঃ মাধ্যমে সংক্রমণের পরিমাণ, দূষকের অধঃক্ষেপণের পরিমাণ, দূষকের প্রকৃতি, দূষকের ঘনত্ব, পানির স্থিতাবস্থা বা প্রবাহমানতা এবং পানির পরিপোষক ও অক্সিজেনের মাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাবে পানি দূষণের প্রকৃতি ও মাত্রায় পার্থক্য হয় । স্মরণ রাখা প্রয়োজন নদী, ঝরণা প্রভৃতি প্রবাহমান পানির দূষণের মাত্রা অপেক্ষা পুকুর ও হ্রদের স্থির পানির দূষণের মাত্রা অনেক বেশি ।

১. **স্থির পানি** (Standing water) : পুকুর ও হ্রদের স্থির পানি সহজে অধিক পরিমাণে দূষিত হয় । পুকুর ও হ্রদের পানি খুব ধীরে প্রতিস্থাপিত হয় । কোনো হ্রদের পানি সম্পূর্ণ মাত্রায় প্রতিস্থাপিত হতে ১০ থেকে ১০০ বছর বা তারও বেশি সময় লাগে । ফলে দূষকের দূষণ মাত্রা সঞ্চারিত হয়ে দ্রুত বিষক্রিয়া ব্যাপ্ত হয় ।
২. **প্রবাহ পানি** (Flowing water) : খাল, ঝরণা, নদী প্রভৃতি প্রবাহমান পানি প্রবাহের ফলে সহজে দূষণ মুক্ত হয় । কিন্তু দূষকের সংক্রমণ অবিরাম ভাবে চলতে থাকলে প্রবাহমান পানিও দূষণ মুক্ত হতে পারে না ।

হ্রদের বাস্তুসংস্থানিক অঞ্চল (Ecological regions of a lake) : হ্রদের পানি তিনটি বাস্তুসংস্থানিক অঞ্চলে বিভক্ত এবং দূষণ হয় ।

১. **উপকূলীয় অঞ্চল** (Littoral region) : হ্রদের উপকূলীয় অগভীর অংশকে উপকূলীয় অঞ্চল বলে। এই অঞ্চলে বেলাবাসী মুলবিশিষ্ট উদ্ভিদ জন্মায়।

চিত্র-৪: হ্রদের তিনটি বাস্তসংস্থানিক অজল

২. **মধ্য হ্রদ অঞ্চল** (Limnetic region) : উপকূল থেকে দূরে হ্রদের মধ্যস্থলের মুক্ত পানি রাশির প্রকৃত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পানিতে প্রচুর সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে, সেখানে উদ্ভিদ প্ল্যাঙ্কটন জন্মায়। এই খাদ্যের সন্ধানে সেখানে প্রচুর মাছের সমাগম হয়।

৩. **অগভীর অঞ্চল** (Profundal region) : হ্রদের অত্যন্ত গভীর অংশে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না, ফলে সেখানে জলজ প্রাণীর সংখ্যা অনেক কম। হ্রদের বেশি গভীর অংশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম গভীর অংশে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সংখ্যা বেশি থাকে।

(ঘ) ভূপৃষ্ঠের পানি দূষণের ধরন (Pattern of surface water pollution)

ভূপৃষ্ঠের পানি দূষণের কয়েকটি ধরন উল্লেখ করা যায়।

১. **পরিপোষক দূষণ** (Nutrient pollution) : নদী হ্রদ ও পানির প্রধানত নানা প্রকার জৈব ও অজৈব পরিপোষক থাকে বলে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণি বেঁচে থাকে। যে পরিমাণ পরিপোষক জলজ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে সেই পরিমাণকে পরিপোষকের স্বাভাবিক ঘনত্ব বলে। কিন্তু স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিপোষক পানিতে থাকলে তা দূষক হিসেবে কাজ করে।

২. **জৈব পরিপোষক ঘটিত দূষণ** (Bio nutrientional pollution) : কাগজ কল, মাংস, মোড়ককরণ জোনিত্র, আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ জোনিত্র থেকে প্রচুর জৈব দূষক নদী, খাল, হ্রদ প্রভৃতি পানিতে এসে পড়ে। এর ফলে ঐরূপ জলাশয়ের পানির উপরের বায়ুবীয় ব্যাকটেরিয়ার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। আবার ব্যাকটেরিয়া জৈব দুষককে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে বলে পানি ক্রমশ পরিশোধিত হয়।

৩. **ব্যাকটেরিয়া দ্বারা জৈব দুষক :** ব্যাকটেরিয়া দ্বারা জৈব দুষকের হ্রাসের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। ব্যাকটেরিয়া পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনকে জৈব দূষক হ্রাসের কাজে লাগায়। এর ফলে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ক্রমে হ্রাস পায়। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি কমে গেলে মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণি অক্সিজেনের অভাবে প্রাণ হারায়।

৪. **পানিতে অক্সিজেন :** পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেলে অবায়ুবীয় ব্যাকটেরিয়া সংখ্যা বেড়ে যায়। এর ফলে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে জৈব দূষক এবং মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণির জীবভরকে বিশ্লেষিত করে মিথেন ও হাইড্রোজেন সালফাইড নামক বিষাক্ত গ্যাস ও অস্বাস্থ্যকর গন্ধ উৎপন্ন করে।

৫. **গ্রীষ্মকালে নদী :** গ্রীষ্মকালে নদী, ঝরণা প্রভৃতির পানির পরিমাণ হ্রাস পেলে স্রোতের বেগ হ্রাস পায়, ফলে জৈব দূষকের ঘনত্ব বেশি হয় এবং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা জৈব দূষকের হ্রাসের ফলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পায়। এ সময় উচ্চ তাপমাত্রার ফলে দূষক দ্রুত ক্ষয় হলেও দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়। জৈব দূষক সম্পূর্ণ হ্রাস পেলে পানি নির্মল হয়। অবশ্য জৈব দূষক সম্পূর্ণ দূর হবার আগে বিভিন্ন উৎস থেকে আবার জৈব দূষক পানিতে এসে পড়লে পানি নির্মল হতে পারে না বরং পানি দূষণের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(ঙ) অজৈব পরিপোষক জনিত পানি দূষণ (Non nutriential water pollutant)

লোহা, গন্ধক, সোডিয়াম, নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম এবং ফসফরাস প্রভৃতি অজৈব পরিপোষক পানির উদ্ভিদ বৃদ্ধিকে দ্রুততর করে। মিষ্টি পানির উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ফসফেট এবং লবণাক্ত পানির উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নাইট্রেট উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ামক। এজন্য পানিতে ফসফেট এবং নাইট্রেটের পরিমাণ বেড়ে গেলে শৈবাল, কচুরীপানা প্রভৃতি অনেক পানির উদ্ভিদের বৃদ্ধি দ্রুততর হয়।

মানুষ নিজেই অজৈব পরিপোষক সৃষ্টি করে পানি দূষিত করে। কৃষি জমিতে যে রাসায়নিক (অজৈব) সার দেওয়া হয় তার প্রায় ২৫ শতাংশ বৃষ্টির পানির সাথে বাহিত হয়ে নদী, পুকুর ও হ্রদের পানির সাথে মিশে। কাপড় ধোলাই এর লন্ড্রীতে ব্যবহৃত ডিটারজেন্টের সাথে প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম ফসফেট বা ট্রাই-ফসফেট (TPP) পানি সংক্রমিত করে।

অবশ্য কয়েকদিন পর অজৈব পরিপোষকের পরিমাণ হ্রাস পেলে জলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং অনেক জলজ উদ্ভিদের বিনাস সাধিত হয়। এই সব মৃত উদ্ভিদের উপর বায়ুবীয় ব্যাকটেরিয়ার পচন ক্রিয়ার ফলে পানিতে জৈব রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা (BOD) মান হ্রাস পায় এবং তা চরম মানের নিচে নেমে গেলে সব ধরনের জলজ প্রাণির মৃত্যু হয়। ফলে অবায়ুবীয় ব্যাকটেরিয়ার পচন শুরু হয়। ফলে পানিতে বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস ও দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

(চ) জৈবিক দূষণ (Bilogical pollution)

মানুষের কার্যাবলীর ফলে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া দ্বারা ভূপৃষ্ঠের পানি সংক্রমিত হয়। পানিতে এরূপ দূষণকে জৈবিক দূষণ বলে। তৃতীয় বিশ্বের সব কয়টি দরিদ্র দেশে পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। পক্ষান্তরে, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে ত্রুটিপূর্ণ আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের ফলে এবং খাবার পানিতে জীবাণু সংক্রমণের ফলে পানি বাহিত রোগের সমস্যা গুরুতর রূপে দেখা দিয়েছে।

(ছ) পানি বাহিত রোগ (Water borne disease)

পানি বাহিত রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর সংক্রমণের ফলে মানুষের বিভিন্ন প্রকার রোগ হয়। এই সব রোগে বৃদ্ধ, যুবক, শিশু সব বয়সের পুরুষ ও মহিলা আক্রান্ত হয়। নিচে পানি বাহিত কয়েকটি রোগের নাম উল্লেখ করা যায়।

(১) ব্যাকটিরিয়া ঘটিত টাইফয়েড,

(২) ব্যাকটিরিয়া ঘটিত কলেরা,

(৩) ব্যাকটিরিয়া ঘটিত সালমোনোপেন্টাসিস,

(৪) ভাইরাস হেপাটাইটিস,

(৫) ভাইরাস ঘটিত পোলিও,

(৬) প্রোটোজোয়া জীবাণু ঘটিত আমাশয় এবং

(৭) পরজীবী কৃমি ঘটিত সিসসোমিয়াসিস(রক্তরাসী ফিতা কৃমিজাত রোগ)।

(জ) বিষাক্ত জৈব পদার্থ ঘটিত পানি দূষণ (Poisonons biotic water pollution)

মানুষ বর্তমানে বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রায় ১০ হাজার কৃত্রিম জৈব যৌগ ব্যবহার করছে। বিভিন্ন উৎস থেকে এই জৈব যৌগের অধিকাংশই পানিতে সংক্রমিত হয় এবং মারাত্মক পানি দূষণ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। পতঙ্গ নাশক (insecticite), কীটনাশক (pesticitic), লতা-পাতা নাশক (herbicides), ছত্রাক নাশক (fungicides), পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল (PCB) এবং পলি সাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (RAH) প্রভৃতি জৈব যৌগ মানুষের স্বাস্থ্যের প্রচুর ক্ষতি সাধন করে।

(ঞ) বিষাক্ত অজৈব পদার্থ ঘটিত পানি দূষণ (Poisonous a biotic water pollution)

ধাতু, অ্যাসিড, অজৈব লবণ প্রভৃতি অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য সুপরিচিত পানি দূষক। এছাড়া পারদ, সীসা, ক্যাডসিয়াম, আর্সেনিক প্রভৃতি মানুষের স্বাস্থ্যের চরম ক্ষতিসাধন করে। যেমন,

(i) পারদ (Mercury) : পারদ মানুষের শরীরের উপর সবচেয়ে বেশি বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। মানুষের অদূরদর্শী কাজের ফলে প্রতি বছর পৃথিবীতে ১০ হাজার মেট্রিক টন পারদ পানিতে ও বায়ুতে নিক্ষেপ করা হয়। যেমন, ভিনাইল ক্লোরাইড প্লাষ্টিকপেন্ট উৎপাদন কারখানা থেকে উপজাত হিসেবে পারদ পয়ঃনালীর মাধ্যমে নদী ও হ্রদের পানিতে এসে পড়ে। আবার ফ্লোর অ্যালকালি, জোনিত্র, শক্তি উৎপাদন জোনিত্র, ভস্মীকরণ কারখানা, ল্যাবরেটরি ও হাসপাতাল থেকে তরল বর্জ্য পদার্থের মাধ্যমে পারদ নদী ও হ্রদের পানির সাথে মিশে।

পানিতে সংক্রমিত পারদ নদী ও হ্রদের পানির নিচে কাঁদার মধ্যে বসবাসকারী অবায়ুবীয় ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ডাই মিথাইল পারদ এবং মিথাইল পারদে পরিবর্তিত হয়। ডাই মিথাইল পারদ খুব দ্রুত পানি থেকে বায়ুতে বাষ্পীভূত হয়, পক্ষান্তরে মিথাইল পারদ ধীরে ধীরে পানির নিচে সঞ্চিত হয় এবং পর্যায়ক্রমে দ্রবীভূত হয়ে পানির সাথে মিশে যায়। আম্লিক তরল মাধ্যমে মিথাইল পারদ উৎপাদন হার ডাইমিথাইল পারদের তুলনায় অনেক বেশি। মিথাইল পারদ সহজে দ্রবীভূত হওয়ায় পানির উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষে জীব পুঞ্জীভূত হয়। এর ফলে পানির বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শিকলের মাধ্যমে উচ্চ পুষ্টিতলের প্রাণীদের দেহে জীব পারদ বেড়ে উঠে। বেড়ে উঠা জীব পারদ পাখিও মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের উপর বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।

(ক) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিষাক্ত অজৈব পদার্থ পারদের প্রতিক্রিয়ার প্রভাব (Reverse reaction of mercury on human health)

- **প্রত্যক্ষ প্রভাব :** ইলেকট্রিক সুইচ, পারদ বাতি এবং ফ্লুরোসেন্ট বাল্বের অসাবধান প্রক্রিয়া করণের ফলে পারদ বাস্পীভূত হয়ে বায়ুর সাথে মিশে যায়। বৃত্তিমূলক শ্রমজীবী মানুষের প্রশ্বাস গ্রহণের সময় এই বাস্পীভূত পারদ সহজেই তাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে রক্তে সংক্রামিত হয়। আবার পারদ সংক্রমিত খাবার পানির মাধ্যমেও পারদ রক্তে প্রবেশ করে।
- **পরোক্ষ প্রভাব :** খাদ্য শিকলের মাধ্যমে পারদ মানুষের দেহে সঞ্চিত হয়। মিথাইলপারদ সংক্রমিত হ্রদ ও নদীর পারদ মাছের দেহে সঞ্চিত হয় এবং এরূপ মাছ আহার করে মানুষের রক্তে পারদ সঞ্চিত হয়।
- **কোষের স্তরে পারদের ক্রিয়া :** মিথাইল পারদ দ্রবীভূত হওয়ার চর্বি কোষে সঞ্চিত হয় এবং ক্রমে রক্তের সাথে মিশে রক্ত মস্তিষ্ক (blood brain) পর্দা অন্তরায় অতিক্রম করে মস্তিষ্কের স্নায়ু (nerve) কোষের উপর প্রভাব ফেলে। মিথাইল পারদ মা-এর শরীর থেকে অমরার মাধ্যমে ভ্রুণে প্রবেশ করে, যে ভ্রুণ মস্তিষ্কের বৃদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি করে।

(খ) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিষাক্ত অজৈব পদার্থ পারদের প্রভাব (Effect of mercury on human health)

মানুষের মস্তিষ্কের উপর মিথাইল পারদের মন্দ বিষক্রিয়া কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। এর ফলে যেসব সমস্যা হয়–

- মানুষ পেশীর নিয়ন্ত্রণে অক্ষম হয়।
- হাত, পা, জিহ্বা ও ঠোঁটে অসাড়তা দেখা দেয়।
- যে কোনো কাজে অনীহা দেখা দেয় এবং মানুষ সহজে উত্তেজিত হয়ে উঠে।
- মানসিক দুর্বলতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়।
- দৃষ্টিহীনতা ও বধিরত্বের সৃষ্টি হয়।
- কথা বলায় বাধার সৃষ্টি হয় এবং
- ভ্রুণ-মস্তিষ্কের অসম্পূর্ণতা সৃষ্টি হয়।

(ii) সীসা (Lead) : মৌল সীসা পানিতে দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু সীসার দ্বি-যোজ্যতা বিশিষ্ট আয়ন (Pb^{2+}) সহজে পানিতে দ্রবীভূত হয় এবং পানিতে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সীসা সংক্রমনের নানা ধরনের প্রভাব রয়েছে।

- মোটর গাড়িতে ব্যবহৃত সংরক্ষিত ব্যাটারির বিদ্যুৎ প্রবাহ ক্ষমতা তৈরির জন্য মৌল সীসা ও সীসার অক্সাইড ব্যবহার করা হয়। সংরক্ষিত ব্যাটারি উৎপাদনের জন্য পুরাতন ব্যাটারির সীসা পুনরায় কাজে লাগান হয়। এ সময় অসতর্ক কাজের ফলে সীসা পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। আবার পরিত্যাক্ত সংরক্ষিত ব্যাটারী পৌর বর্জ্যে পরিণত হলে এর সীসা পরিবেশকে সংক্রমিত করে।
- পানি ও মাটিতে সংক্রমিত সীসা থেকে দ্রবীভূত দ্বি-যোজন বিশিষ্ট আয়ন (Pb^{2+}) উৎপন্ন হয়ে পানির স্থলভাগের উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ করে এবং উদ্ভিদ থেকে খাদ্য শিকলের মাধ্যমে মানুষের দেহের কোষে সীসা সঞ্চিত হয়।
- **পেট্রোল দহন :** পেট্রোলের সাথে স্বল্প পরিমাণে অশুদ্ধ সীসা মিশে থাকে। মোটর গাড়ি চলাচলের সময় পেট্রোল দহনের ফলে সীসা গ্যাসে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে।
- বাতাসে ভাসমান সীসাকণা বৃষ্টির পানির সাথে স্থলভাগের মাটি, পুকুর, নদী, হ্রদ এবং মানুষের পানিতে এসে মিশে। পানির মাছ এবং স্থলভাগের উদ্ভিদ থেকে সীসা খাদ্য শিকলের মাধ্যমে মানুষের দেহে প্রবেশ করে।
- **গ্যাসোলিন দহন :** গ্যাসোলিন ব্যবহৃত মোটর গাড়ির গ্যাসোলিন সাথে টেট্রা অ্যালকিল সীসা (PhR_4) মিশানো হয়। মিশ্রিত গ্যাসোলিন দহনের সময় এ থেকে উৎপন্ন সীসা ড্যাইহ্যালাইড (PbBrCl) বের হয়ে বাতাসের সাথে মিশে এবং সূর্যের আলোর প্রভাবে তা সীসা অক্সাইডে পরিণত হয়। বাতাসে সীসা অক্সাইডের কণা অ্যারোসলে পরিণত হয়। বৃষ্টির পানির

সাথে সীসা অক্সাইড ভূপৃষ্ঠ পতিত হলে পানির ও স্থলের বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শিকলে প্রবেশ করে মানুষের ক্ষতি সাধন করে।

(iii) পানির নাইট্রেট ও নাইট্রাইট (Nitrates and nitrites of water) : নাইট্রেট ও নাইট্রাইট অজৈব পানি দূষক। নিরাপদ পানির ট্যাঙ্ক, দহন ক্ষেত্র, অধিক রাসায়নিক সার যুক্ত শস্য, বর্জ্যপদার্থ প্রক্রিয়া করণের জোনিত্র প্রভৃতি উৎস থেকে পানির সাথে মিশে নাইট্রেট মানুষের দেহে প্রবেশ করে নাড়ি ভূড়িতে ক্রমে বিষক্রিয়া নাইট্রাইটে পরিণত হয়। মানুষের স্বাস্থ্যের উপর নাইট্রেট ও নাইট্রাইটের প্রভাব রয়েছে।

- মানুষের রক্তের লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন নাইট্রাইটের সংস্পর্শে জারিত হয়ে মেটাহিমোগ্লোবিন রূপান্তরিত হলে হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন পরিবাহিতা হ্রাস পায়। মানুষের দেহের কলাকোষে অক্সিজেনের যোগান হ্রাসের ফলে রক্তের স্বল্পতা এবং হৃদপিন্ডের ইসচিমিয়া রোগের সৃষ্টি হয়।
- নাইট্রাইট দূষণ গ্রামাঞ্চলে শিশু-মৃত্যুর প্রধান কারণ। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গ্রামাঞ্চলে নাইট্রাইট বিষক্রিয়ায় প্রতি বছর অনেক শিশুর মৃত্যু হয়। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন উন্নত দেশেও নাইট্রাইট বিষক্রিয়ায় প্রচুর শিশু মারা যায়।

(iv) পানির ক্লোরিন (Water chlorine) : ক্লোরিন একটি অতি সক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ।

- শহর/নগরের পৌর প্রতিষ্ঠান থেকে যে খাবার পানি সরবরাহ করা হয় সেই পানির ব্যাকটিরিয়া ধ্বংস করার জন্য ক্লোরিন মিশান হয়। কিন্তু প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ক্লোরিন ব্যবহারের ফলে তা মানুষের দেহে ক্লোরিনজাত বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।
- শহর/নগর আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ জোনিত্র থেকে বেরিয়ে আসা বর্জ্য পদার্থ যুক্ত পানির জীবাণূ নাশ করার জন্য ক্লোরিন ব্যবহার করা হয়। অধিক পরিমাণে ক্লোরিন ব্যবহারের ফলে সেই পানি পুকুর, নদী ও হ্রদের পানি দূষিত করে।
- শক্তি উৎপাদন জোনিত্র শীতল করার জন্য ব্যবহৃত নলের ভিতরে ও বাইরে যে শৈবাল, ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জন্ম লাভ করে তা ধ্বংস করার জন্য ক্লোরিন ব্যবহার করা হয়। ঐরূপ জোনিত্র থেকে বেরিয়ে আসা উদ্বৃত্ত পানি নদীর পানির সাথে মিশে নদীর পানি দূষিত করে।

(v) লবণ (Salt) : শীত প্রধান দেশে শীত ঋতুতে রাস্তার উপর সঞ্চিত তুষার গলাবার জন্য সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড লবন ব্যবহার করা হয়। তুষার গলা পানির সাথে লবণ ক্রমশ পুকুর, নদী, হ্রদ এবং ভূগর্ভের পানিতে সংক্রমিত হয়। ভূপৃষ্ঠের পানিতে অধিক লবণ থাকলে লবণের প্রভাব সহ্য করতে অসমর্থ উদ্ভিদ ও প্রাণির বিভিন্ন প্রজাতি পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিলুপ্তি হয়।

(ট) সামুদ্রিক পানি দূষণ (Ocean Water Pollution)

সাগর মহাসাগরের পানি দূষণের বিভিন্ন কারণের মধ্যে সামুদ্রিক তেল থেকে দূষণ ও প্লাষ্টিক দূষণ অন্যতম। পেট্রোল থেকে সামুদ্রিক পানি দূষণ (Ocean water pollution due of petroleum) দূষণের অন্যতম কারন। ২০১৪ সালে সুন্দরবনে তেলবাহী জাহাজ ডুবে যাওয়ার কারণে সমগ্র সুন্দরবন এলাকায় পানি, বন পরিবেশ, পশুপাখি, মাছ ইত্যাদি দূষণের শিকার হয় এবং উদ্ভিদ ও জলজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

- প্রতি রাষ্ট্রের সমুদ্র পানি সীমার মধ্যে তীর থেকে দূরবর্তী মহিসোপানের মাটির নিচে প্রাকৃতিক পেট্রোল ভান্ডার রক্ষিত রয়েছে। (বাংলাদেশের মহীসোপান থেকে পেট্রোল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে)। মহীসোপান থেকে পেট্রোল উত্তোলনের জন্য যে নলকূপ বসান হয় মাটি ও নলকূপের সংযোগ স্থল থেকে প্রতিনিয়ত পেট্রোল চুইয়ে সমুদ্রের পানি সংক্রমিত বা দূষিত হয়।

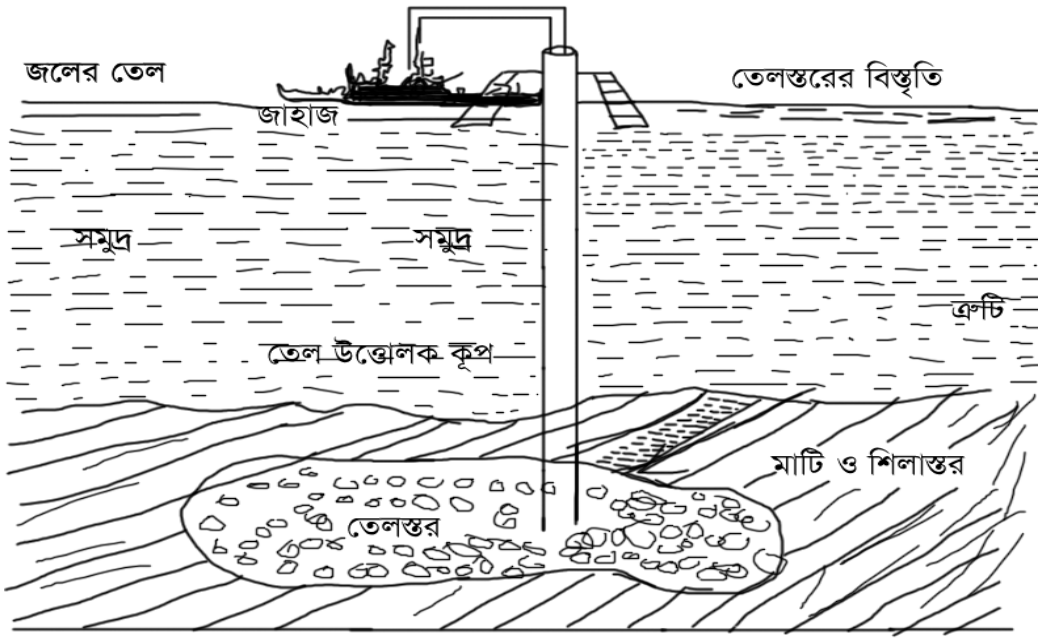

চিত্র-৫ : মহিসোপান থেকে পেট্রোল নির্গমনের ফলে পানি দূষণ

- নলকূপ ফেটে যাওয়া, নলকূপে ভাঙ্গন এবং সমুদ্রের উপরের পেট্রোবাহী ট্যাঙ্কার জাহাজ থেকে পেট্রোল উপচে পড়ে সমুদ্রের পানি সংক্রমিত করে।
- ট্যাঙ্কার জাহাজ পরিষ্কার করা এবং পানির উপর জাহাজ স্থির রাখার জন্য জাহাজের তলদেশে সঞ্চিত পানি মাঝে মাঝে পরিবর্তন করার জন্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। এই বর্জ্য পানির সাথে পেট্রোল মিশ্রিত থাকায় সমুদ্রের পানি সংক্রমিত হয়।
- দেশের অভ্যন্তরে অসতর্কভাবে পেট্রোল ব্যবহারের ফলে তা বিধৌত হয়ে মাটি সংক্রমিত করে। বৃষ্টির পানির পৃষ্ঠ সরণের সাথে সেই পেট্রোল নদীর মাধ্যমে সমুদ্রের পানি সংক্রমিত করে।
- মহীসোপান থেকে পেট্রোল উত্তোলন প্রক্রিয়ায় ত্রুটি এবং উত্তোলন ক্ষেত্র থেকে উপকূলে পেট্রোল স্থানান্তরের সময় পেট্রোল নির্গমনের ফলে সমুদ্রের পানি সংক্রমিত হয়।
- দূর্ঘটনার ফলে পেট্রোলবাহী ট্যাঙ্কার বিধ্বস্ত হলে প্রচুর পরিমাণে অশোধিত পেট্রোল সমুদ্রের পানি সংক্রামিত করে।

৩.৪ পানির আর্সেনিক ও মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি (Water Arsenic and Health Risk of the People)

মানুষের দেহে আর্সেনিক সংক্রমণের প্রধান উৎস ভূগর্ভের (ভৌম) পানি। নলকূপের পানি আর্সেনিক দূষণের মাধ্যম পরিবেশিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আবার ভূগর্ভের পানি কেবলমাত্র গুণগত মানেই নয়, প্রাপ্যতার দিক থেকেও স্বল্পতার নজীর বহন করছে। নলকূপের পানির ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ততই প্রকট হয়ে উঠছে। খাবার পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা প্রতি লিটারে ০.০৫ মিলিগ্রাম বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারণ করলেও পৃথিবীর অনেক দেশে খাবার পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ ঐ মাত্রা অপেক্ষা অনেক বেশি। আর্সেনিক অত্যন্ত বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ হওয়ায় স্বল্প মাত্রার আর্সেনিকের দীর্ঘস্থায়ি প্রভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয় এবং উচ্চ মাত্রার আর্সেনিকের তাৎক্ষণিক প্রভাবে মানুষের মৃত্যু হয়।

আর্সেনিকের পরিবেশিক উৎস (Environmental Sources of Arsenic)

আর্সেনিক পরিবেশিক কতগুলো উৎস হচ্ছে,

- লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বাংলাদেশের নদীগুলো হিমালয় থেকে যে পলি বহন করে এনেছে তার সাথে ভেসে এসেছে আর্সেনিক এবং তা চুঁইয়ে ভূগর্ভের পানিতে সঞ্চিত হয়েছে। নলকূপের মাধ্যমে আর্সেনিক মিশ্রিত পানি ভূপৃষ্ঠে উঠে আসে আর তা পান করে মানুষ আর্সেনিকে আক্রান্ত হয়। অধিক দিন আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষের ক্যান্সার হয়।
- আর্সেনিক সমৃদ্ধ কীটনাশক যৌগের অবাধ ব্যবহারের ফলে আর্সেনিক দ্বারা মাটি ও পানি সংক্রমিত হয়। বিভিন্ন কাজে

মানুষ আর্সেনিক যুক্ত পোকা-মাকড় নাশক, সীসা আর্সেনেট (As-V) এবং লতা-গুল্ম নাশক, ক্যালসিয়াম আর্সেনেট (As-V), সোডিয়াম আর্সেনাইট (As-III) এবং প্যারিস গ্রীণ (As-III) প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয় এবং এগুলো থেকেই আর্সেনিক দূষণ সৃষ্টি হয়।

- সোনা ও সীসার আকরিকের সাথে আর্সেনিক থাকে। আকরিক থেকে এই দুইটি খনিজ নিষ্কাশনের সময় কিছু আর্সেনিক পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে।
- কয়লার সাথেও কিছু আর্সেনিক থাকে। এজন্য কয়লা দহনের সময় আর্সেনিক বায়ুমন্ডলে যুক্ত হয়।
- খাবার পানি, বিশেষ করে ভূগর্ভ থেকে নলকূপের মাধ্যমে উত্তোলিত পানি পান করার ফলেই প্রধানত মানুষের দেহে আর্সেনিক অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয়। আর্সেনিক অ্যাসিড ($H_2A_2O_4$) অথবা ডিপ্রোটোনেটেডে আকারে আর্সেনিক পানির সাথে মিশে থাকে। খাবার পানিতে অজৈব আর্সেনিকের গড় পরিমাণ প্রায় ২.৫ ppb। এক জন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ প্রতিদিন ১.৬ লিটার পানি পান করে। সেই হিসাবে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দেহে প্রতিদিন প্রায় ৪ মাইক্রোগ্রাম আর্সেনিক প্রবেশ করে।

খাদ্য দ্রব্যে আর্সেনিকের মাত্রা পরীক্ষা করে জানা গেছে যে, আর্সেনিকের মাত্রা মুরগীর বুকের মাংস ০.০০, লাল মরিচে ০.০৬, শুকনা মটর শুঁটিতে ০.০৯, লবণ বিহীন মাখনে ০.২৩, তাজা রসুনে ০.২৪, বেগুনে ০.৮২, চা-তে ০.৮৯, গরুর কলিজায় ১.৪০, চিংড়ি মাছে ১.৫০, মুড়িতে ১.৬০, টেবিল লবণে ২.৭১, সামুদ্রিক লবণে ২.৮৩, ছত্রাকে ২.৯০,লাইখ্যাতে ৮.৮৬ এবং চিংড়ির খোসায় ১৬.০০ পি.পি.এম। আর্সেনিক বিষ ধীরে ধীরে প্রাণি দেহে পুঞ্জীভূত হয়। প্রাণি ছাড়াও বিভিন্ন উদ্ভিদ আর্সেনিক বিষে আক্রান্ত হয়। ধান, পেঁয়াজ ও শিম জাতীয় উদ্ভিদ সহজে আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। পক্ষান্তরে আপেল, আঙ্গুর ও টমেটোর আর্সেনিক সহ্যগুণ বেশি।

(ক) মানুষের দেহে আর্সেনিকের সহ্যসীমা (Endurable limit of arsenic in human body)

খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়ের সাথে আর্সেনিক প্রবেশ করে মানুষের দেহের বিভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র মাত্রায় সঞ্চিত হয়। চুল ও নখে সবচেয়ে বেশি আর্সেনিক সঞ্চিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা মানব দেহে আর্সেনিকের সহ্যসীমা ০.০৫ পি.পি.এম বলে নির্ধারণ করেছে। অবশ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) মানব দেহে আর্সেনিকের সহ্য সীমা ০.১ পি.পি.এম বলে নির্ধারণ করেছে।

ডাক্তারী পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, স্বাস্থ্যবান মানুষ অপেক্ষা অপুষ্টিতে আক্রান্ত রোগীর দেহ আর্সেনিকের বিষক্রিয়া আক্রান্ত করে। আবার শহর/নগর অঞ্চলের মানুষ অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলের মানুষ, বিশেষ করে ভূমিহীন কৃষক ও জেলে পরিবারের লোক আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় বেশি পরিমাণে আক্রান্ত হয়েছে।

(খ) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের প্রভাব (Effect of airsenic on human health)

- আর্সেনিক ধাতু না হলেও ধাতুর অনেক গুণ এর মধ্যে রয়েছে। এটি একটি প্রোটোপ্লাজমিক বিষ। এর বিষ ক্রিয়ার মানব দেহে পচনশীল ক্ষত সৃষ্টি হয়। ফ্রান্সে নির্বাসিত সম্রাট নেপোলিয়ানের মৃত দেহের চুল ও নখ পরীক্ষা করে উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছিল, ফলে তাকে আর্সেনিক বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।
- পানীয় ও খাদ্যের মাধ্যমে আর্সেনিক মানব দেহে প্রবেশ করে ফুসফুস, যকৃৎ, বৃক্ক, মূত্রথলী এবং ত্বকে ক্যান্সারের সৃষ্টি করে। আর্সেনিক প্রভাবিত রোগী ধূমপান করলে ক্যান্সারের সম্ভাবনা বেশি।
- আর্সেনিকের দীর্ঘস্থায়ি বিষক্রিয়ায় বমি, উদরাময় এবং খাদ্য অন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে।
- আর্সেনিক উৎসেচক (enzyme) জীবন্ত প্রাণির দেহ কোষে উৎপন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ, এটি নিজে পরিবর্তিত না হয়ে অন্য পদার্থের পরিবর্তন সাধন করে) কাজে বাধার সৃষ্টি করে বিপাকীয় অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে।

চিত্র-৬: মানুষের স্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের প্রভাব

(গ) আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর দেহে উপসর্গ (Symtom of arsenic affected patients body)

আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত রোগীর দেহে প্রাথমিক উপসর্গ হচ্ছে গলা জ্বালা করা, পিপাসা বৃদ্ধি পাওয়া, বমি বমি ভাব, পেটে তীব্র ব্যথা অনুভব, রোগীর গলা ও মুখ শুকিয়ে যায়, উদ্দীপনা হ্রাস পায়, শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে করতলে ও পায়ের পাতায় কালো কালো দাগের সৃষ্টি হয় এবং চামড়া ও চুল উঠে যায়। এই উপসর্গ ব্ল্যাকফুট রোগ নামে পরিচিত। আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হলে অন্ধত্ব দেখা দিতে পারে, এমনকি রোগীর মৃত্যু হয়।

চিত্র-৭: আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর হাত ও পা

(ঘ) আর্সেনিক বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা পাবার প্রাথমিক ব্যবস্থা (Primary steps to defent from arsenic perverse reaction)

জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শফিক (২০০০), আর্সেনিকের বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে দুটি সুপারিশ করেন:

(ক) আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত নলকূপের পানি কখনই পান করা যাবে না।

(খ) আর্সেনিকে সংক্রমিত পানিতে ফিটকিরি মিশিয়ে ২৪ ঘণ্টা রেখে দিবার পর সেই পানি ব্যবহার করা যাবে।

(ঙ) পেট্রোলিয়ামের মাধ্যমে সমুদ্রের পানি দূষণের ফলে পরিবেশিক প্রভাব (Environmental effect of sea water pollution through petroleum)

পেট্রোলিয়ামের মাধ্যমে সমুদ্রের পানি দূষণ হয় এবং পরিবেশিক নানা ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে।

- সামুদ্রিক পানি সংক্রমিত হবার ফলে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ পুষ্টি পদার্থের উপস্থিতির পরিমান, পানি p^H দ্রাব্যতা প্রভৃতি অজৈব পদার্থ এবং পানির উদ্ভিদ ও প্রাণির উপস্থিতি প্রভৃতি জৈব পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পায়।
- পেট্রোল জনিত দূষণের ফলে সামুদ্রিক খাদ্য শিকলের স্বাভাবিক গতিশীলতার বাধার সৃষ্টি হয়। প্রচুর শৈবাল এবং উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন ও প্রাণি প্ল্যাংকটন বিষাক্ত হয়, খাবার উপযোগী মাছের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়।
- সংক্রমিত তেল ধীরে ধীরে অধঃক্ষেপণের ফলে মাটি সংক্রমিত হয়, মাটির অভ্যন্তরে বসবাসকারী কাঁকরা জাতীয় প্রাণি মারা যায়। এর পরও যে সব প্রাণি টিকে থাকে সেগুলোর কোষে পেট্রোলের যৌগ জীব পুঞ্জীভূত হয় এবং এসব প্রাণি আহারের ফলে মাছ সংক্রমিত হয়, যা খাবার উপযোগী নয়। অর্থাৎ এসব সংক্রমিত মাছ মানুষ ভোগ করলে মানুষের শরীরে একইরকম সমস্যা দেখা দিতে পারে।
- পেট্রোল দূষণের ফলে উপকূলের এবং খাড়ীর মাছের পোনা উৎপাদন হ্রাস পায়, ফলে সেখানে বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য নষ্ট হয়।
- পেট্রোল সংক্রমিত মাছ আহারের ফলে পাখীর পেশীর স্বাভাবিক ক্রিয়ায় বাধার সৃষ্টি হয়, ফলে পাখী ক্রমশ উড়বার ক্ষমতা হারায়।
- পেট্রোল দূষণের ফলে পাখির পালকের অপরিবাহী ক্রিয়া হ্রাস পায়। পালকের স্বল্পতার ফলে পাখি বেশি ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না এবং বেশি শীতের দিনগুলোতে অনেক পাখীর মৃত্যু হয়।
- এসব পরিস্থিতি ২০১৪ সালে বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় দেখা দেয়। কারণ এই সুন্দরবন এলাকায় তেলবাহী জাহাজ ডুবে ছিল।

(চ) প্লাষ্টিক থেকে সামুদ্রিক পানি দূষণ (Ocean water pollution due to plastic)

প্লাষ্টিকথেকে সামুদ্রিক পানি দূষণ হয়।

- উদ্ভিদ ও প্রাণি থেকে উৎপন্ন প্লাষ্টিকব্যবহারের পর সমুদ্রে ফেলে দিলে এই পাষ্টিকের প্রভাবে সমুদ্রের পানি দূষিত হয়ে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট করে।
- মাছ ধরার নাইলনের জাল, প্লাষ্টিকের থলি, পপ্লাষ্টিকের ফিতা প্রভৃতি ব্যবহারের পর সমুদ্রে ফেলে দিলে এগুলো জৈব অবক্ষয়যোগ্য নয় (bio-nondegradationable) বিধায় অবিকৃত অবস্থায় সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত হলে এর প্রভাবে পানি দূষিত হলে সামুদ্রিক জীবের ক্ষতি সাধিত হয়।
- মাছ এবং অপেক্ষাকৃত বড় সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণি প্লাষ্টিক খেয়ে ফেললে অবিকৃত প্লাষ্টিক প্রাণির পাকস্থলীতে সঞ্চিত হয়, যা কখনই প্রাণির দেহ থেকে নির্গত হয় না। ক্রম সঞ্চিত পাষ্টিকের কারণে প্রাণির অধিক খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না এবং খাদ্যের স্বল্পতার জন্য প্রাণি মারা যায়।

(ছ) চিকিৎসা বর্জ্য ও আবর্জনা থেকে সামুদ্রিক পানি দূষণ (Ocean water pollution due to medical wastage and refuges)

বিভিন্ন দেশে চিকিৎসা বর্জ বস্তু ও রক্ত সংক্রমিত ব্যান্ডেজ, সূচ, ব্যবহৃত সিরিঞ্জ প্রভৃতি নদী বা সমুদ্রের পানিতে ফেলে দেওয়া হয়, এর ফলে নদী বা সমুদ্রের পানি দূষিত হয়। আবার আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ জোনিত্র থেকে নিঃসৃত আংশিক প্রক্রিয়াকৃত এবং একেবারেই প্রক্রিয়া না হওয়া আবর্জনা সমুদ্রে ফেলে দেওয়ায় বর্জ্য পদার্থের মাধ্যমে প্রচুর জৈব রাসায়নিক এবং বিষক্রিয়া ধাতু সমুদ্রের পানি সংক্রামিত করে।

৩.৫ মাটি দূষণ (Soil Pollution)

অজৈব খনিজ, জৈব (উদ্ভিদ-প্রাণির অবশেষ) পদার্থ, পানি ও বায়ু নামক চারটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত মাটি। মাটির উপরিভাগে যাবতীয় পুষ্টি পদার্থ সঞ্চিত হয় বলে পৃথিবী পৃষ্ঠের এই মাটি উর্বর ও উৎপাদনশীল। উপরের স্তরে বসবাসকারী কেঁচো, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক প্রভৃতি প্রাণি উপরের স্তরের পুষ্টি পদার্থ আত্মস্থ ও মাটির সাথে মিশ্রণ এবং মাটির মধ্যে বায়ু চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে মাটির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে মানুষের তৈরি দূষণ ক্রিয়ার ফলে উপরের স্তরের মাটির পুষ্টি পদার্থ অপসারিত হচ্ছে, মাটি

সৃষ্টিকারী জীবের গতিশীলতায় বাধার সৃষ্টি হচ্ছে, বহিরাগত অপ্রয়োজনীয় জৈব ও অজৈব উপাদান মাটির সাথে মিশছে। এর ফলে ভবিষ্যতে পরিবেশ সঙ্কটের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাটির দূষক পানি ও বায়ু দূষণের মাধ্যমে তেমনই পানি ও বায়ুর দূষণ মাটির দূষণ সৃষ্টি করে।

(ক) মাটি দূষণের ধরন (Pattern of soil pollution)

মাটির দূষক ১. জৈব দূষক (biotic pollutants) এবং ২. অজৈব দূষক (abiotic pollutant) এই দু'ধরনের হলেও তা মূলত ৭ ধরনের লক্ষ্য করা যায়।

১. **জৈবিক দূষণ**(Biotic pollution) : আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ জোনিত্র থেকে বেরিয়ে আসা অসংক্রমিত স্লজ, হাসপাতালের রক্তমাখা ব্যান্ডেজ, সূচ, সিরিঞ্জ প্রভৃতি আবর্জনা এবং প্রক্রিয়াবিহীন পৌর আবর্জনার সাথে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া ও কৃমি থাকে। স্থলভাগে স্তুপীকৃত করা ছাড়াও এগুলো সার হিসেবে কৃষিভূমিতে ব্যবহার করা হয়। কৃষি ভূমিতে উৎপন্ন শাক সবজি ও ফল রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। মানুষ, গরু মহিষ, হাঁস-মুরগী প্রভৃতি প্রাণি এই সবজি ও ফল আহার করে রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

২. **পরিপোষক দূষণ :** পুষ্টি পদার্থকে পরিপোষক বলে। মাটির উপরের স্তরে পরিপোষক সঞ্চিত থাকে। এই উপরের স্তরের মাটি থেকেই উদ্ভিদ পরিপোষক গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। মাটিতে বসবাসকারী মৃতজীবী (detrivorss) এবং বিযোজক (decomposers) জীবগুলো দ্বারা মাটির খনিজ উপাদানের সাথে মৃত জীব ও জীবের অংশগুলো মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন হিউমাসের আত্মীকরণ, বাতান্বয়ন এবং পানি মিলিত হয়ে উপরিতলের মাটির পরিপোষক উৎকর্ষতা সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে কৃষি পদ্ধতিতে কীটনাশক, লতাগুল্ম নাশক প্রভৃতি প্রয়োগের ফলে মাটির পরিপোষকের পুনরাবর্তন সঠিকভাবে হচ্ছে না। এজন্য পরিপোষকের হ্রাস বা নিঃশেষ হবার ফলে মাটি অনুর্বর হয়ে পড়ছে এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। মাটির পরিপোষক হ্রাসের বিষয়টিকে পরিপোষক দূষণ বলে। প্রতি বছর একই জমিতে একই ফসল উৎপাদন, পরপর দুইটি চাষের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান হ্রাস এবং বেশি বেশি হারে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক দ্রব্য জমিতে ব্যবহারের ফলেই মাটির পরিপোষক দূষণ ঘটে। বেশি পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহারের কারণে মাটি বিযোজক ও মৃতজীবী জীবগুলো মারা যায়, হিউমাস তৈরি হতে পারে না এবং মাটির মিশ্রণ, বাতান্বয়ন এবং পানি আসক্তির হ্রাস হয়। ফলে সামগ্রিকভাবে মাটির উৎকর্ষতা হ্রাস পেলে মাটির P_H মান এর পরিবর্তন হয়।

৩. **জৈব পদার্থ জনিত দূষণ :** প্রধানত আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে কীটনাশক ও মাটি নিয়ন্ত্রকের অবাধ ব্যবহারের ফলে জৈব পদার্থ জনিত মাটি দূষণ ঘটে। এড্রিন, অলড্রিন, ডাই-এলড্রিন, ক্লোরডেন, হেপ্টাক্লোর, ডি.ডি.টি প্রভৃতি অগানোক্লোরিন কীটনাশক পানিতে দ্রবীভূত হয় না বলে এগুলো মাটির প্রধান দূষক। এই দ্রব্যগুলো অতিমাত্রায় এবং অসাবধানে ব্যবহারের ফলে এর কিছু অংশ দ্বারা মাটি সংক্রমিত হয়। মাটিতে বসবাসকারী মৃতজীবী ও বিযোজক জীব ও কীট নাশকগুলো জৈব অবক্ষয়যোগ্য (non biodegradable) না হওয়ায় বহু বছর মাটির মধ্যে অবিকৃত অবস্থায় থাকে এবং মাটি ধৌতকরণ প্রক্রিয়ায় কোনো কোনো সময় পানি সংক্রমিত করে। মাটির মধ্যে

আবার, সীসা, পারদ, আর্সেনিক সম্বন্ধ জৈব-যৌগ মাটির পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টিকারী (conditioner) হিসাবে ব্যবহারের ফলে ভারী ধাতুগুলো বাগানে ও কৃষি ভূমিতে স্থায়ি ভাবে সঞ্চিত হয় এবং ক্রমে মাটি থেকে উদ্ভিদে এবং খাদ্য শিকলের মাধ্যমে প্রাণিদেহে পরিবাহিত হয়।

৪. **অজৈব পদার্থজনিত দূষণ :** বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং পৌর সংস্থা যে সব অজৈব কঠিন বর্জ্য অপরিকল্পিতভাবে স্তুপ করে রাখে সেগুলোর প্রভাবে মাটি দূষিত হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ধাতু প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, কয়লা ও খনি শিল্প, প্লাষ্টিক ও পেষ্ট উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে ফেলে দেওয়া পদার্থের মাধ্যমে সীসা; পারদ, দস্তা, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি অজৈব বিষাক্ত ধাতু মাটি সংক্রমিত ও দূষিত করে। বিভিন্ন রাস্তা-অলি-গলির পাশে ফেলে দেওয়া কঠিন আবর্জনা পৌর কর্তৃপক্ষ এক জায়গায় স্তুপীকৃত করে রাখে। গৃহস্থালির অদাহ্য জ্বালানি, খাদ্যদ্রব্যের অংশ, ধাতব পাত্র, পরিত্যক্ত যানবাহন, অব্যবহৃত ষ্টোরেজ ব্যাটারি, কাচ, কাগজ প্রভৃতি অজৈব পদার্থ স্তুপীকৃত থেকে মাটি সংক্রমিত করে। মাত্রারিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলেও মাটি নাইট্রেট ও ফসফেট দ্বারা সংক্রমিত হয়। মাটিতে ধরে রাখা ভারী ধাতু উদ্ভিদ শিকড়ের মাধ্যমে গ্রহণ করে এবং উদ্ভিদ থেকে খাদ্য শিকলের মাধ্যমে মানুষ ও প্রাণিদেহে প্রবেশ করে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

৫. **প্লাষ্টিক ও পলিথিন দূষণ :** ব্যবহারের পর প্লাষ্টিক ও পলিথিন দ্রব্য আবর্জনা হিসেবে মাটির উপর ফেলে দেওয়া হয় পলিপাটইনের চা-কাপ প্লাষ্টিকের বালতি, জগ, মগ, বাটি প্রভৃতির ভগ্নাংশ, ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, পলিথিনের ব্যাগ, কলমের অংশ প্রভৃতি দ্রব্য যেখানে সেখানে ফেলে রাখার ফলে মাটি দূষিত হয়। প্লাষ্টিক ও পলিথিন দ্রব্যগুলো জৈব-অবক্ষয় মাটির সাথে মিশে না। দীর্ঘদিন জলবায়ুর উপাদানগুলোর সংস্পর্শে বর্জ্য প্লাষ্টিক ও পলিথিন থেকে বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান নিঃসৃত হয়ে মাটি দূষিত করে। প্লাষ্টিক থেকে বেরিয়ে আসা রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে মাটির মৃতজীবী ও বিযোজক জীব মারা যায়। ফলে খাদ্য শিকলের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদ এবং পরোক্ষভাবে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী দেহে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করে।

চিত্র -৮ : পড়ে থাকা প্লাষ্টিক ও পলিথিনের সংস্পর্শে মাটি দূষিত হচ্ছে

৬. **অ্যাসিড দূষণ :** অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাবে উপরিস্তরের মাটির উৎকর্ষতা হ্রাস পায়। সুতরাং বায়ু দূষণের পরোক্ষ প্রভাবে অ্যাসিড দ্বারা মাটি দূষিত হয়। বায়ুতে উপস্থিত সালফার ও নাইট্রোজেন অক্সাইড বৃষ্টির পানির সাথে বিক্রিয়ার সৃষ্টি করে সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয়ে মাটির উপর এসে পড়ে। অ্যাসিড বৃষ্টির দ্বারা মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধি পায়।

৭. **তেজষ্ক্রিয় পদার্থ জনিত দূষণ :** কল-কারখানা ও পারমাণবিক পরীক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসা তেজষ্ক্রিয় পদার্থ বর্জ্য এবং পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে বায়ুতে সংক্রমিত তেজষ্ক্রিয় পদার্থ বৃষ্টির পানির সাথে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসার ফলে মাটি তেজষ্ক্রিয় পদার্থ দ্বারা সংক্রমিত হয়। পারমাণবিক শক্তি জোনিত্র (plant) থেকে বেরিয়ে আসা বর্জ্যবস্তুর সংস্পর্শে মাটি সংক্রমিত হয়। এছাড়া মহাজাগতিক রশ্মি বিকিরণ ও পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে তেজষ্ক্রিয় কার্বন (C-14) মাট সংক্রমিত করে। মাটিতে তেজষ্ক্রিয় পদার্থ থেকে বিকিরিত রশ্মি এবং খাদ্য শিকলের মাধ্যমে জীবদেহে তেজষ্ক্রিয়তা পুঞ্জিভূত হয়ে মন্দ প্রভাব ফেলে।

(খ) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মাটি দূষকের প্রভাব (Effect of soil pollutants on human health)

মাটির জৈব, অজৈব ও জীবজনিত দূষণ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মাটি একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করে রোগগ্রস্থ মানুষের শরীর থেকে সুস্থ মানুষের শরীরে এবং রোগাক্রান্ত প্রাণি থেকে সুস্থ মানুষের শরীরে রোগ জীবাণু সংক্রমিত করে। কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড এবং প্যারাটাইফয়েড সৃষ্টিকারী ব্যাকটিরিয়া মানুষের শরীর থেকে মাটিতে সংক্রমিত হয়, আবার মাটি থেকে সুস্থ্য মানুষের শরীরে সংক্রমিত হয়। ব্যাকটিরিয়া ছাড়াও কৃমি, গোলকৃমি, হুকওয়ার্ম ও হুইপওয়ার্ম মাটি থেকে মানুষের শরীরে রোগ জীবাণু সংক্রমিত করে। আবার মাটিতে সৃষ্ট রোগবাহী পতঙ্গের মাধ্যমেও মানুষের শরীর আক্রান্ত হয়।

মাটি ও মৃত জৈব পদার্থের উপর বেড়ে উঠা ছত্রাক মানুষের সারকিউটেনিয়াস রোগের সৃষ্টি করে। প্রশ্বাস বায়ু ও ক্ষত স্থানের মাধ্যমে জীবগুটি (spore) প্রত্যক্ষভাবে মাটি থেকে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। পারদ, সীসা, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি মাটি দূষক ভারী ধাতু প্রত্যক্ষ ভাবে বা খাদ্য শিকলের মাধ্যমে মানুষের শরীরের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে। আবার কীটনাশক, ছত্রাক নাশক, লতাগুল্ম নাশক দ্রব্য, পি.এ.এইচ, পি.সি.বি প্রভৃতি খাদ্য শিকলের মাধ্যমে জীবদেহে পুঞ্জিভূত এবং বর্ধিত হয়ে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করে।

৩.৬ তেজস্ক্রিয় দূষণ (Radion Active Pollution)

তেজস্ক্রিয় পদার্থের অসতর্ক ব্যবহার, প্রক্রিয়া করণের সময় তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণের ফলে পরিবেশের যে পরিবর্তন হয় তাই তেজস্ক্রিয় দূষণ। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যাপক ও অদূরদর্শী ব্যবহারের ফলে তেজস্ক্রিয় দূষণের সৃষ্টি হয়। পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন জোনিত্র জ্বালানি হিসাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করা হয়। আবার পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে তেজস্ক্রিয় শক্তি ব্যবহার করা হয়। পারমাণবিক চুল্লীর তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থের অসতর্ক স্থানাস্তরের সময় তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে পরিবেশের জৈব উপাদানের প্রাণ প্রবাহ দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। এর ফলে অসংখ্য উদ্ভিদ এবং মানুষসহ বহু পাখি মারা যায়। অনেক উদ্ভিদ ও মানুষসহ প্রাণির চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে।

তেজস্ক্রিয়া দূষণের ধরন (Pattern of radion active pollution)

(ক) প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় দূষণ : মহাজাগতিক রশ্মি বায়ু মন্ডলে প্রবেশের সাথে সাথে এর প্রভাবে স্বল্পায়ু মৌল কার্বন ১৪ এবং হাইড্রোজেন-৩ উৎপন্ন হয়। এই উভয় মৌল প্রত্যক্ষভাবে জীব জগতের ক্ষতি সাধন করে। উৎপন্ন কার্বন-১৪ ও হাইড্রোজেন-৩ দ্রু ত কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয় এবং পানিতে জারিত হয়। উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি বায়ুমন্ডল ও বারিমন্ডলে প্রবেশ করে।

ভূত্বকে বর্তমান ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম আকরিক থেকে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরিত হয়। এছাড়াও পটাসিয়াম-৪০ ও রুবিডিয়াম-৮৭ থেকেও তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি করে। প্রবাহিত পানি স্রোত তেজস্ক্রিয় আকরিক বিশিষ্ট পাহাড় ও মাটির উপর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় পানি তেজস্ক্রিয় পদার্থ দ্বারা দূষিত হয়।

(খ) মানুষের সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় দূষণ : তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রক্রিয়াকরণ, পারমাণবিক অস্ত্র ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহারের সময় তেজস্ক্রিয় দূষণের সৃষ্টি হয়। আবার গবেষণা কাজে ও চিকিৎসা প্রণালীতে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার করা হয়।

বাতাসে ভেসে বেড়ানো তেজস্ক্রিয় পদার্থের কণা ও তেজস্ক্রিয় গ্যাস শ্বাসনালীর মধ্য দিয়ে মানুষের ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফলে দেহকোষ তেজস্ক্রিয় বিকিরণে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবিত হয়। আবার খাবার পানি পান করার সময় প্রত্যক্ষভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। খাদ্য শিকলের মাধ্যমে মানুষের শরীরে তেজস্ক্রিয় পদার্থ সংক্রমণকে পরোক্ষ প্রভাব বলে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের অসতর্ক স্থানান্তরের সময়ে মাটি ও পানি সংক্রমিত হয়। কতিপয় জলজ ও স্থলজ উদ্ভিদ দেহে তেজস্ক্রিয় পদার্থ পুঞ্জীভূত হয়। খাদ্য শিকলের মাধ্যমে তা উদ্ভিদ থেকে প্রাণি দেহে এবং প্রাণিদেহ থেকে মানুষের শরীরে প্রবাহিত ও সংক্রমিত হয়।

৩.৭ শব্দ দূষণ (Sound Pollution)

একজন মানুষের সাথে অন্য মানুষের পারস্পরিক এবং ভৌত পরিবেশের সাথে প্রাণির মিথস্ক্রিয়ার প্রধান মাধ্যম শব্দ। সুরযুক্ত শব্দ কোন শব্দ দূষণের সৃষ্টি করে না, পক্ষান্তরে সুরবর্জিত শব্দই দূষণের জন্য দায়ী। মানুষের কার্যকলাপ শব্দ দূষণের প্রধান কারণ। বনভূমি ধ্বংস, নগরায়ণ, শিল্পের প্রসার, প্রযুক্তির প্রসার, পরিবহণের প্রসার এবং মানুষের জীবন ধারায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন শব্দ দূষণের সৃষ্টি হয়। বর্তমান বিশ্বে শব্দ দূষণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই শব্দ দূষণ দ্বারা মানুষের মস্তিষ্কে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। এর দ্বারা নাক, কর্ণ, মস্তিষ্ক এদের উপর আঘাত প্রাপ্ত হয়। এই আঘাত বারংবার হওয়ার কারণে মানুষের হৃদস্পন্দন, মস্তিষ্কক্রিয়া দেখা দেয় বা মাথায়, কানে আঘাতের কারণে পক্ষঘাত প্রাপ্ত হয়।

চিত্র-৯ : গাড়ির হর্ণ থেকে শব্দ দূষণ

মানুষের স্বাস্থ্যের উপর শব্দ দূষণের প্রভাব (Effect of Sound Population on Human Health)

মানুষের স্বাস্থ্যের উপর শব্দ দূষণের নানা ধরনের প্রভাব ফেলে। যেমন,

(ক) শব্দ দূষণের ক্ষণস্থায়ি প্রভাব :

- হঠাৎ তীব্র শব্দে কানের পর্দার ক্ষতি হয়, কখনও কখনও কানের পর্দা ছিড়ে যায়।
- শ্রবণতন্ত্রের যে কোনো অংশে ক্ষতির কারণে শ্রবণ ক্ষমতার হ্রাস পায়।
- অবিরত সূরবর্জিত শব্দ হতে থাকলে অন্যান্য প্রয়োজনীয় শব্দ শ্রবণে বাধার সৃষ্টি হয়।

(খ) শব্দ দূষণের দীর্ঘস্থায়ি প্রভাব :

- বিশেষ তীব্র শব্দে কানের মধ্যে শব্দ গ্রাহক কোষের ক্ষতি হলে অস্থায়ি বা স্থায়ি বধিরতার সৃষ্টি হতে পারে।
- সূর বর্জিত শব্দে কানের পর্দা চিরতরে নষ্ট হতে পারে। কানের মধ্যস্থলের তিনটি অস্থি থেকে মস্তিষ্কে শব্দ প্রবাহকারী স্নায়ুর (nerve) কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস পায় বা বধিরতার সৃষ্টি হয়।

(গ) পরোক্ষ প্রভাবসমূহ :

- সূর বর্জিত শব্দের দীর্ঘস্থায়ি প্রভাবে হৃদস্পন্দন পরিবর্তিত হয়।
- তীব্র শব্দের প্রভাবে হৃদ উৎপাদন হ্রাস পায়।
- সূর বর্জিত শব্দের প্রভাবে গড় রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়।
- তীব্র শব্দের প্রভাবে রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা হ্রাস পায়।
- তীব্র শব্দের প্রভাবে রক্তের গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রার হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়।
- তীব্র শব্দের প্রভাবে রক্তে দানাযুক্ত শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
- শব্দ দূষণের কারণে শ্বসনের (শ্বাস-প্রশ্বাস) হার পরিবর্তিত হতে পারে।
- সূরবর্জিত তীব্র শব্দের প্রভাবে শ্বসন গভীরতার বৃদ্ধি হয়।
- শব্দ দূষণের ফলে রাতকানা রোগের সৃষ্টি হয়।
- শব্দ দূষণের ফলে চোখের রন্ধ্রের প্রসারণ হয়।
- শব্দ দূষণের ফলে চোখে বর্ণ প্রত্যক্ষকরণ হ্রাস পায়।
- শব্দ দূষণের ফলে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু তন্ত্রের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।
- শব্দ দূষণের ফলে বুকের স্নায়ু র ক্রিয়া হ্রাস পায় এবং চলাচল ক্রিয়া বাধা প্রাপ্ত হয়।

- শব্দ দূষণের ফলে ঘুমে ব্যাঘাত হয়, অনেকের স্বাভাবিক ঘুমের পরিমাণ হ্রাস পায় ।
- শব্দ দূষণের ফলে মাথা ধরা ও উত্তেজিত হবার প্রবণতা দেখা যায় ।
- শব্দ দূষণের ফলে অনেকের স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায় ।
- শব্দ দূষণের ফলে অনেক শ্রমজীবী মানুষের মানসিক অবসাদ ও কাজে অনীহার সৃষ্টি হয় ।

৩.৮ গন্ধ দূষণ (Odour Pollution)

প্রায় সব ধরনের বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার জৈব অবক্ষয়যোগ্য উপাদান রয়েছে, যা উদ্বায়ী ও গন্ধ সৃষ্টি করে । এগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অস্বস্তিকর গন্ধ ছড়ায় । গ্যাসীয় অবস্থায় এগুলো নাকের মধ্যে প্রবেশ করলে নাক জ্বালা করে, শ্বাস আবরণী কলা এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় । ফলে ক্ষুদা মন্দ, মাথা ঝিমঝিম,বমি বমি ভাব, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয় । এরূপ গন্ধ যুক্ত স্থানে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করলে গন্ধ সৃষ্টিকারী পদার্থগুলো রক্তে প্রবেশ করে এবং রক্তের সাথে বাহিত হয়ে বিভিন্ন তন্ত্রে পৌঁছায় এবং তন্ত্রগুলোর অস্বাভাবিক কাজ বৃদ্ধি করে । বায়ুমন্ডলের কয়েকটি প্রভাবকের উপর গন্ধের উপস্থিতি ও ঘনত্ব নির্ভর করে । গন্ধের উৎস, মানুষ থেকে এর দূরত্ব, বাতাস প্রবাহের গতিপথ, বাতাসের বেগ প্রভৃতির উপর গন্ধ দূষণ নির্ভর করে ।

গন্ধের উৎস ও এর প্রভাব (Sources of odour and its effects)

যে সব যৌগ থেকে গন্ধের সৃষ্টি হয় সেগুলোকে চারটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা যায় ।

১. **গন্ধ বিমুক্তকারী, রেচনকারী ও ক্ষরণকারী জীবিত বস্তু :** কিছু সংখ্যক অণুজীব বা জীবাণু এবং প্রাণি নানা প্রকার গন্ধ সৃষ্টি করে । কিছু সরলবর্গীয় গাছ এবং উন্নত ধরণের কিছু উদ্ভিদ, রজন ও তারপিন জাতীয় গন্ধবহ পদার্থ ক্ষরণ করে; এগুলো তীব্র সুগন্ধি । মাইক্রোমোনোস্পোরো ও স্ট্রেপ্টোমাইসোটিস নামক পরভোজী ব্যাকটিরিয়াগুলো বিভিন্ন প্রকার গন্ধ ছড়ায় । অনুরূপ ভাবে অনাবিনা সারসিনালিস নামক নীলাভ সবুজ শৈবাল এবং ট্রাইকোডারমা নামক ছত্রাক বিভিন্ন ধরনের গন্ধ ছড়ায় । বাঘ, সিংহ, কুকুর, ছুঁচো (চিকা), গান্ধীপোকা প্রভৃতি প্রাণির দেহ থেকে নির্দিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায় ।

২. **গৃহস্থলী ও শিল্প-কারখানা থেকে নির্গত পদার্থ :** গৃহস্থলী ও শিল্প-কারখানা থেকে প্রতিদিন প্রচুর গন্ধবাহী হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), অ্যামোনিয়া (NH_3) বিভিন্ন ধরনের অ্যামাইন যৌগ, অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড যৌগ, ফেনল, বিভিন্ন এস্টার, ক্লোরিন, ক্লোরিনযুক্ত বিভিন্ন ধরনের জৈব যৌগ পদার্থ বেরিয়ে এসে পরিবেশ অস্বস্তিকর করে তোলে ও অস্বাস্থ্যকর গন্ধ ছড়ায়; অধিকাংশ সময় এই পদার্থগুলো জৈব ক্রিয়া ব্যাহত করে ।

৩. **জৈব যৌগের জীবাণু ঘটিত পচন :** মৃত জীব দেহ থেকে বিভিন্ন জৈব পদার্থ পচনকারী জীবাণু দ্বারা বিয়োজিত ও সরলীকৃত হয় । এই সময় কটুগন্ধ সৃষ্টি লাভ করে পরিবেশ দূষিত করে তোলে । বিভিন্ন জৈব পদার্থের পচনের ফলে নানা প্রকার জৈব অ্যাসিড, অ্যালকোহল, মিথেন (CH_4), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), অ্যামেনিয়া (NH_3) প্রভৃতি পরিবেশে মিশে স্বীয় গন্ধ দ্বারা বায়ু দূষিত করে তোলে ।

৪. **অতি পৌষ্টিকতা :** অধিকাংশ নীলাভ সবুজ শৈবাল দ্বারা বস্তু পচনের ফলে মিথেন (CH_4) এবং কিছু ক্ষতিকারক পদার্থের সৃষ্টি হয়ে কটু গন্ধ সৃষ্টি করে এবং জলাশয়ে জৈব অক্সিজেন চাহিদা বৃদ্ধি করে ।

৩.৯ আর্সেনিক দূষণ (Arsenic Pollution)

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে বিশেষ করে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান এসব দেশে বহুকাল আগে থেকেই ওষুধ ও বিষ হিসাবে আর্সেনিক ব্যবহৃত হচ্ছে । অজৈব পরিবেশের উপাদান হওয়ার সব সময়ই স্বল্প পরিমাণে আর্সেনিক পরিবেশ থেকে জীবদেহে সংক্রমিত হয় এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় পুনরায় জীব দেহ থেকে পরিবেশে ফিরে যায় । মাটি ও পানি থেকে উদ্ভিদ আর্সেনিক গ্রহণ করে । খাদ্য শিকলের মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ থেকে আর্সেনিক জৈবিক প্রক্রিয়ায় পরিবেশে ফিরে যায় । আর্সেনিক সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্ট বিষক্রিয়া জীবজগতের অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন সাধন করে থাকে । আর্সেনিক সংক্রমণে মানুষসহ সমগ্র জীব পরিবেশের অনাকাঙ্খিত পরিবর্তনকে আর্সেনিক দূষণ বলে । বর্তমানে বিশ্বের সব দেশেই আর্সেনিক দূষণের কথা শুনা যাচ্ছে । বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে সোনারগাঁও, নোয়াখালী, যশোর, বরিশাল এবং ঢাকা আশপাশ জেলায় থানা বিশেষে আর্সেনিকের দূষণের প্রকোপ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

(ক) মাটিতে আর্সেনিকের বণ্টন (Allocation of arsenic in earth)

প্রকৃতিতে সব সময়ই স্বল্প পরিমাণে আর্সেনিক থাকে। মাটির আর্সেনিকের অধিকাংশই লোহা, নিকেল ও সালফারের যৌগ হিসেবে রয়েছে। মাটি সৃষ্টিকারী শিলাই আর্সেনিকের প্রধান উৎস। শিল্প বর্জ্য পদার্থ ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক দ্রব্য মানুষের সৃষ্ট উৎস এবং এই উৎসগুলো মাটির আর্সেনিকের মাত্রা বৃদ্ধি করে। মাটিতে স্বাভাবিক আর্সেনিক সংযুক্তিমাত্রা ৫ PPm। অবশ্য মানুষের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সংক্রামিত আর্সেনিকের মাত্রা এই মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। আর্সেনিক ও অন্যান্য বিষপূর্ণ (Toxic) পদার্থের সঞ্চয়, রূপান্তর ও বিস্তারে মাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কীটনাশক, লতা-গুল্ম নাশক, ছত্রাক নাশক হিসাবে আর্সেনিক যৌগের বেশি বেশি ব্যবহারের ফলে, মাটিতে আর্সেনিকের স্বাভাবিক মাত্রা বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাটি থেকে উদ্ভিদের মূল, কান্ড, পাতা, ফল প্রভৃতিতে আর্সেনিক সঞ্চিত হয়। উদ্ভিদ থেকে খাদ্য শিকলের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাণিদেহে আর্সেনিক প্রবেশ করছে। প্রাণি ও লতাপাতা, ফলমূল ইত্যাদি থেকে খাদ্য দ্রব্যের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে।

(খ) পরিবেশে আর্সেনিকের উৎসসমূহ (Sources of arsenic in environment)

ভূত্বকের সব জায়গায় আর্সেনিক মৌল রয়েছে। অ্যালবারটাস ম্যাগনাস ১২৫০ খ্রিষ্টাব্দে আর্সেনিক আবিষ্কার করেন। মাটি উৎপাদনকারী শিলায় পরিবেশের মোট আর্সেনিকের ৯৯ শতাংশের বেশি রয়েছে।

(i) প্রাকৃতিক উৎস (Natural source) : আগ্নেয়শিলা বা রূপান্তরিত শিলার তুলনায় পাললিক শিলায় আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি আগ্নেয়গিরি, চুনাপাথর ও বেলে পাথরে আর্সেনিকের গড় ঘনত্ব যথাক্রমে ১.৫, ২.৬ ও ৪.৪ PPm।

মাটি, উদ্ভিদ, মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণি, সমুদ্র ও মাইক্রেবস এবং বায়ুমন্ডল আর্সেনিকের অন্যান্য প্রাকৃতিক উৎস। উদ্ভিদ, প্রাণি, মাইক্রোবস ও বায়ুমন্ডলের তুলনায় মাটি ও সমুদ্রে সঞ্চিত আর্সেনিকের পরিমাণ অনেক বেশি। সারা বিশ্বে মাটির গড় আর্সেনিক ঘনত্ব ৭.২ PPm হলেও অসংক্রমিত প্রাকৃতিক মাটিতে স্বাভাবিক আর্সেনিক ঘনত্ব ৫.৬ PPm। অবশ্য স্থানভেদে এই ঘনত্ব স্বতন্ত্র। সালফাইড আকরিক সমৃদ্ধ মাটিতে আর্সেনিকের পরিমাণ ৮০০০ মিলিগ্রাম As/kg। সালফারের সাথে আর্সেনিকের সংযোগ আছে বলে কাঁদা, গ্যাস, ভূগর্ভের পানি ও মাটিতে আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি।

(i) মানুষের তৈরি উৎসে আর্সেনিক (Source of man made arscnic): মানুষের তৈরি আর্সেনিকের উৎসসমূহ হচ্ছে,

- **খনি প্রক্রিয়া ও ধাতু নিষ্কাশন :** তামা, সীমা ও দস্তার আকরিকের সাথে প্রাকৃতিক ভাবে আর্সেনিক রয়েছে। খনি থেকে এই ধাতুর আকরিক ধাতবগুলো উত্তোলনের সময় এবং আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশনের সময় আর্সেনিক পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে।
- **কয়লা :** আর্সেনিক-পাইরাইট হিসাবে কয়লায় আর্সেনিক থাকে। এর পরিমাণ ১ মিলিয়াম/কে.জি. এর কম থেকে ৯০ মিলিগ্রাম/কে.জি. এর বেশি হতে পারে। খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের সময় এবং তাপ বিদ্যুৎ জোনিত্র ও রেলগাড়ির ইঞ্জিনে কয়লা পোড়াবার সময় আর্সেনিক পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে।
- **কয়লা দহন উপজাত :** তাপ বিদ্যুৎ জোনিত্রে কয়লা পোড়াবার সময় নির্গত ফ্লাই-অ্যাশে (Fly-ash) সংযুক্ত আর্সেনিক দ্বারা মাটি সংক্রমিত হয়। প্রতি কিলোগ্রাম ফ্লাই-এ্যাশো সর্বোচ্চ ৬৩০০ মিলিগ্রাম আর্সেনিক থাকে। কয়লার উপস্থিত +৩ এবং +৫ যোজ্যতা সম্পন্ন আর্সেনিক পোড়াবার সময় তা গ্যাসে পরিণত হয়ে বায়ুমন্ডলে মিশে যায়। পোড়াবার পর কয়লা শীতলিকরণের সময় গ্যাসীয় আর্সেনিক ঘনীভূত হয়ে ফ্লাই-অ্যাশ কণার সাথে লেগে থাকে। ফ্লাই-অ্যাশ বায়ুমন্ডল থেকে ভূপৃষ্ঠে অধঃক্ষেপিত হলে সেই আর্সেনিক মাটি ও পানি সংক্রমিত করে।
- **নর্দমার আবর্জনা :** রাস্তার পাশের নর্দমার ময়লায় কিছু পরিমাণে আর্সেনিক থাকে।
- **ভূগর্ভের পানিতে আর্সেনিক সংক্রমণ :** মাটির কণার গায়ে আর্সেনিক লেগে থাকে। মাটিতে লোহা, অক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড না থাকলে বা কম থাকলে মাটি বেশি পরিমাণে আর্সেনিক ধারণ করতে পারে না। ফলে পানির সাথে বিধৌত হয়ে মাটির স্তরের মধ্য দিয়ে আর্সেনিক ভূগর্ভে পৌঁছায় এবং ভৌম পানি সংক্রমিত করে। এছাড়াও আর্সেনিক সমৃদ্ধ পাললিক শিলা, গন্ডশিলা ও গ্রানাইট শিলাস্তরে ও খনিজ আকরিকের সাথে সঞ্চিত আর্সেনিক ভৌম পানি আক্রান্ত ও দূষিত করে। [পানি দূষণ অংশে আর্সেনিক দূষণ আলোচনা করা হয়েছে।]

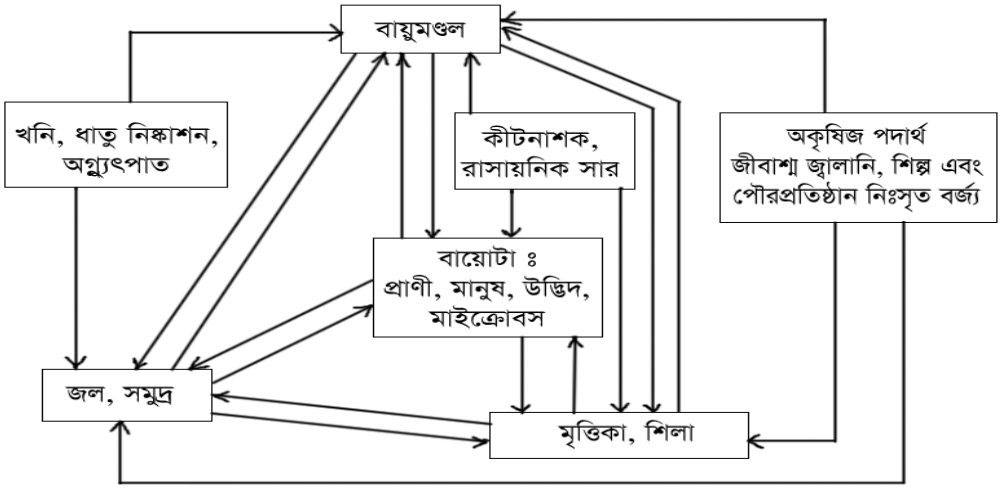

চিত্র-১০: আর্সেনিক চক্র দেখানো হয়েছে

(গ) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার প্রভাব (Perverse reaction of arsenic on human health)

আর্সেনিকের স্বল্পস্থায়ি ও দীর্ঘস্থায়ি বিষক্রিয়া মানুষের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তন্ত্রের গঠনগত ও কাজের অস্বাভাবিক পরিবর্তন সাধন করে, ফলে বিভিন্ন বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। বেশি মাত্রার আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় শ্বসন যন্ত্র ও পাকস্থলী প্রভাবিত হলে ৩০ মিনিটের মধ্যেই তার বাহ্যিক লক্ষণ দেখা দেয়, অবশ্য পাকস্থলীতে প্রবেশ ঘটলে এই বিষক্রিয়া লক্ষণ কিছু পরে দেখা দেয়। আর্সেনিক সংক্রামিত পানি পান করলে বা সংক্রমিত খাদ্য আহার করলে আর্সেনিক মানব দেহে ক্রমে অধিক থেকে অধিক হারে সঞ্চিত হলে তার দীর্ঘস্থায়ি লক্ষণগুলো ক্রমে প্রকাশ পায়। এর ফলে মানব দেহে গঠনগত ও কার্যগত স্থায়ি অস্বাভাবিক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ধীরে ধীরে মানুষের মৃত্যু ঘটে। আত্মহত্যার উদ্দেশ্য আর্সেনিক যৌগ খেয়ে ফেলার ৩০ মিনিটের মধ্যেই আর্সেনিক বিষক্রিয়া শুরু হয়। খাদ্যদ্রব্যের সাথে আর্সেনিক মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে কিছু বিলম্বে এর বিষক্রিয়া শুরু হয়।

১. পাক তন্ত্রের উপর আর্সেনিকের প্রভাব (Effects of arsenic on stomach) : পাকতন্ত্রের উপর আর্সেনিকের কিছু প্রভাব রয়েছে।

- স্বল্প মাত্রায় আর্সেনিকের সংক্রমনের বিষক্রিয়ায় মুখগহ্বর ও গলা শুকিয়ে যায় ও ঢোক গিলতে কষ্ট হয়।
- অবিরত বমি বমি ভাবসহ পুনঃ পুনঃ বমি হয়।
- ক্ষুধা, পিয়াসা ও দৈহিক ওজন হ্রাস পায়।
- উর্ধ্ব ও নিু উদরে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হয়।
- পেটে যন্ত্রণা অনুভূত হয়।
- যকৃতের অস্বাভাবিকতা শুরু হয়, কখনও কখনও জন্ডিস রোগ শুরু হয়।
- নিঃশ্বাস বায়ু ও মলে রসুনের গন্ধ প্রকাশ পায়।
- পাকস্থলীর রক্তনালীর প্রাচীর নষ্ট হয়, রক্তনালী প্রসারিত হয়।
- পাকস্থলী ও আন্ত্রিক সরলপেশীর যন্ত্রণা শুরু হয় এবং মধ্যবর্তী তীব্রতাসহ উদরাময় দেখা দেয়।
- চাল ধোয়া পানির মত পাতলা দুর্গন্ধময় মল সবেগে বেরিয়ে আসতে থাকে।

২. শ্বসন ক্রিয়ার উপর প্রভাব (Effects on exhalation) : শ্বসন ক্রিয়ার উপর প্রভাবসমূহ হচ্ছে,

- আর্সেনিকে আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাসক্রিয়া ব্যহত হয়।
- গ্যাসীয় আর্সেনিকের প্রভাবে ফুসফুসের ক্রিয়া ব্যাহত হয়।
- ফুসফুসের রক্ত জালিকার প্রাচীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং রক্তরস ফুসফুসে সঞ্চিত হয়।
- আর্সেনিক গ্যাসের প্রভাবে, রক্তের মাধ্যমে কলাকোষে অক্সিজেন পরিবহণে বিঘ্নিত হয়।
- ফুসফুসের প্রদাহ এবং হাপানির উৎপত্তি হয়।

৩. ত্বকের উপর প্রভাব (Effects skin): ত্বকের উপর আর্সেনিকের প্রভাবসমূহ হচ্ছে,

- আর্সেনিক কণা ও বা?র সংস্পর্শে শরীরের চামড়ার সব জায়গায় ফুসকুড়ি দেখা দেয় ।
- আর্সেনিক গুড়া বা কণার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে মুখ ও চোখের পাতায় জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হয় ।
- পায়ের পাতা ও হাতের তালুর ত্বকে অতিরঞ্জন হয় ।
- অপেক্ষাকৃত কালো দেহতট অধিকতর সৃষ্টি হয় ।
- কখনও কখনও ত্বকে লাল সিটে চাগের সৃষ্টি হয় ।
- হাত, পা, বুক ও মাথার চুল সামঞ্জস্যহীন ভাবে ঝরে যায় ।
- হাত ও পায়ের নখের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় ।
- হাত ও পায়ের নখে অসংখ্য সাদা ক্ষতের সৃষ্টি হয় ।
- মুখগহ্বর ও কাঁধের ত্বকে নীলাভ লাল রক্তোচ্ছাপ ঘটে ।
- সূর্যের আলোকে উন্মুক্ত দেহ ত্বক আর্সেনিক সংস্পর্শে ক্যানসারে আক্রান্ত হয় ।

৪. রক্তের উপর প্রভাব (Hematologic effects) : রক্তের উপর প্রভাবসমূহ হচ্ছে,

- অস্থিমজ্জার জনিত্ব কোষ থেকে রক্তাকোষ উৎপাদন ব্যাহত হয় ।
- আর্সেনিক হিমোগ্লোবিন ও সংশ্লেষণে বাধা দেয় ।
- আর্সেনিকের প্রভাবে হিমোলাইসিস ত্বরান্বিত হয়, রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা হ্রাস পায় ।
- রক্তের অক্সিজেন পরিবহণ ক্ষমতা হ্রাস পায় ।
- অ্যানিমিয়া ও হ্রম্বোসাইটোপিনিয়া সংঘটিত হয় ।

৫. যকৃতের উপর প্রভাব (Hepatic effects) : যকৃতের উপর প্রভাবসমূহ হচ্ছে,

- যকৃতের (লিভারের) অসংশোধনযোগ্য অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয় ।
- যকৃতের ক্ষয়িষ্ণুতা ঘটে ।
- চূড়ান্ত অবস্থায় যকৃতের আকৃতি বৃদ্ধি পায়, ইসোফেগাস থেকে রক্ত ক্ষরণ শুরু হয় এবং জন্ডিস রোগের সৃষ্টি হয় ।
- অ্যালকোহল আর্সেনিক প্রভাবিত যকৃত সিরোসিসকে ত্বরান্বিত করে ।
- আর্সেনিক যকৃত কোষের মাইটোকন্ড্রিয়াকে বিনষ্ট করে ।

৬. বৃক্কের উপর প্রভাব (Renal effects) : বৃক্কের উপর প্রভাবসমূহ হচ্ছে,

- আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় বৃক্কে (কিডনী) অভিঘাত (shock) সৃষ্টি হয় ।
- রক্তের আয়তন ও বৃক্কের রক্তচাপ হ্রাস পায় ।
- বৃক্কের মূত্র উৎপাদন ক্রিয়া ব্যাহত হয় ।
- আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় বৃক্কের বহিরাংশ নষ্ট হয় ।
- আর্সেনিকের ক্রিয়া দ্বারা, রেনাল ক্যাপিলারী, রোনাল টিবিউল এবং গ্লুমেরুলাস বিনষ্ট হয় ।
- মুত্রের মাধ্যমে রক্ত কণিকা নির্গত হয় ।
- মুত্রের মাধ্যমে প্রোটিন নির্গমন শুরু হয় ।

৭. হৃৎপিন্ডের উপর প্রভাব (Cardivasculer effects) : হৃৎপিন্ডের উপর প্রভাবসমূহ হচ্ছে,

- আর্সেনিকের প্রভাবে রক্ত প্রবাহী শিরা, উপশিরাগুলো প্রসারিত হয় ।
- রক্তের আয়তন ও প্রোটিনের পরিমাণ হ্রাস পায় ।
- ভেন্ট্রিকলের স্পন্দন হার বৃদ্ধি পায় ।
- হৃদপিন্ড ও কলাকোষে অক্সিজেন সরবরাহ হ্রাস পায় ।
- হৃদপেশীর গঠনগত অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয় ।
- হাত ও পায়ের কলাকোষে অক্সিজেন সরবরাহকারী রক্তনালীর ব্যাস হ্রাস পায় । ফলে হাতের পাতা ও পায়ের তলায় কালো ও পিন্ডাকৃতি ক্ষত সৃষ্টি হয় ।

৮ স্নায়ুর উপর প্রভাব (Neurological effects) স্নায়ুর উপর প্রভাবসমূহ হচ্ছে,

- কেন্দ্রিয় ও প্রান্তীয়স্নায়ুতন্ত্রের নিউরোনের অ্যাক্সল বিনষ্ট হয়।
- স্পর্শ ও যন্ত্রণা অনুভূতি লোপ পায়।
- প্রসারিতকরণ মাংসাপেশীর পক্ষাঘাত ঘটে।
- হাতের আঙ্গুলে কম্পন দেখা দেয়।
- স্পর্শ, চাপ, যন্ত্রণা প্রভৃতির অনুভূতি লোপ পায়।
- সুষুম্নাকান্ডের অঙ্কীয় শৃঙ্গের বক্ষীয় স্নায়ু কোষ বিনষ্ট হয়।
- গ্রন্থিভাঁজ করার সহায়ক ক্লেক্সর মাংসপেশী ও অঙ্গ প্রসারিত করণ এক্সটেনসার মাংসাপেশীর ক্ষয়িষ্ণুতা ঘটে এবং সংকোচী ক্রিয়া হ্রাস পায়।
- মাথা ধরা, স্মৃতি শক্তি লোপ, অস্বাভাবিক উত্তেজনা, অস্থির নিদ্রা ও অনিয়ন্ত্রিত মূত্র ক্ষরণ দেখা দেয়।

৪. পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারি নীতিসমূহ (Government Policy for Environmental Management to Reduce Pollution)

দূষণ অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ বান্ধব অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমগ্র বিশ্বে বিশেষ করে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশ জোটবদ্ধ হয়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করছে। দূষণ অর্থনীতিও প্রতিকূল পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পরিবেশের ভারসাম্য উন্নয়ন ও সমতায়নে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক জোট দলবদ্ধভাবে কাজ করছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর দাবি উন্নত দেশগুলোর উপর যারা পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী তাদেরই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তাদের উচিত হবে পরিবেশ ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দেয়া। এজন্য পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর জনগণের বিদ্যমান জীবন-জীবিকার চাহিদা এবং সুষ্ঠু পরিবেশগত সম্পদ ব্যবস্থাপনার মধ্যে বাস্তবভিত্তিক সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবৎং বাস্তবায়ন করে থাকে। এর কার্যক্রম পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ব্যবস্থা পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৭ এর আওতাভুক্ত পরিবেশ সংরক্ষণ বিধির মাধ্যমে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের সাথে অন্তর্ভুক্ত করে কার্যকর করা হয়। এই কর্মসূচিতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চলমান থাকবে এবং শক্তিশালী করা হবে। পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ, আন্তর্জাতিক কনভেশনের বাস্তবায়ন এবং সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রোটোকল এবং দেশে বিদ্যমান পরিবেশ আইন বাস্তবায়ন কর্মসূচিকে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কর্মসূচি গ্রহণ করে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত পরিকল্পনা সময়ে বিপুল পরিমাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি, সরকার কর্তৃক পরিবেশ উন্নয়ন এবং রক্ষার জন্য আরও বেশ কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব কর্মসূচিসমূহ হচ্ছে,

(ক) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কর্মসূচি/ নীতি (Controlling program/policies for air pollution)

বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৭ (ইসিএ, ৯৭) বায়ুদূষণের বহুমুখী ফলপ্রসূ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে সংশোধনী গ্রহণ করেছে। ঢাকা শহরের বিদ্যমান বায়ুদূষণের বর্তমান ধারার উর্ধ্বগতি অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ২০০৩ সালের ১লা জানুয়ারি হতে টু-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার যানবাহন নিষিদ্ধ করা হয়। ২০০৫ সালের ১৯ জুলাই তারিখে ইসিআর '৯৭ এ উলিখিত বায়ুর আদর্শমান সংশোধন করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই) ক্লিন এয়ার এবং টেকসই পরিবেশ এর প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যাতে শহর এলাকার বায়ুর বিভিন্ন প্রকার দূষণ চিহ্নিত এবং এ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা যায়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (এমওইএফ) বায়ুদূষণ রোধ করার জন্য ইট ভাটাগুলোতে জ্বালানি সাশ্রয় পদ্ধতি গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে এবং মূল্যবান বনজ সম্পদের ক্ষতি এবং কৃষিভূমি অবনতি না করার জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইট ভাটা হতে নির্গমন প্রশমনের জন্য ডিওই সম্প্রতি একটি গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যে, ২০১০ সালের পর হতে ১২০ ফুট স্থায়ি চিমনি অনুমোদন দেয়া হবে না। জিগজ্যাগ, হাইব্রিড হাফম্যান এবং উলম্ব স্তম্ভ আকারের ইট ভাটা প্রতিস্থাপনের জন্য উৎসাহিত করা হবে। ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা সমাধান এবং বিষাক্ত নির্গমন নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বাস্তবে কোনো ব্যবস্থাই কাজে আসেসি।

(খ) যানবাহন সংক্রান্ত বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ (Control of vehicular air pollution)

বাংলাদেশের বড় শহর, বিশেষ করে ঢাকা শহরের বায়ুদূষণের অন্যতম একটি বড় কারণ হলো যানবাহন হতে নির্গমন। যানবাহন হতে নির্গমন কমানোর জন্য সিএএসই প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যাবলি গ্রহণ করা হবে এবং এর মাধ্যমে ট্রাফিক ব্যবস্থার গতিময়তা বৃদ্ধি এবং পথিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন; যানবাহন সংক্রান্ত ট্রাফিক গতিময়তা এবং পথিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর জোর প্রদান এবং রাস্তার যানবাহন পরিবীক্ষণ এর মাধ্যমে যানবাহন সংক্রান্ত ট্রাফিক গতিময়তা এবং মান উন্নয়ন কার্যকরী করা। শহরের বিভিন্ন স্থানে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালনা জোরদার করা উচিত। ঢাকা শহরের বায়ু দূষণ ও পরিবহন সমস্যা সমাধান করা না গেলে শহরে বাস করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। বিশ্বের অযোগ্য বসবাসের উপযোগী শহর হবে।

(গ) শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ (Control of noise pollution)

ঢাকা শহরে শব্দ দূষণ হচ্ছে যেখানে সেখানে এবং যখন তখন শব্দ করা থেকে বিরত থাকার আইনগত ব্যবস্থা। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এ শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের সীমাবদ্ধতার কারণে সাধারণ জনগণসহ সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা সমূহের মতামতের আলোকে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০৬ আইন পাশ করা হয়। ঢাকা শহরসহ বাংলাদেশের কিছু শহরে বিভিন্ন ধরনের দূষণের মধ্যে শব্দদূষণ সবচেয়ে খারাপ দূষণগুলোর অন্যতম। পরিবেশ এবং বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১০ সালের মধ্যে ৯০-১১০ ডেসিবেল হতে ৪৫-৫৫ ডেসিবেল পর্যন্ত শব্দদূষণের মাত্রা কমানোর লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। বাস্তবে এ কাজের গতি বৃদ্ধি পায়নি। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন-শৃংখলার লোকদের প্রত্যক্ষভাবে কাজে লাগাতে হবে।

(ঘ) শিল্প সংক্রান্ত দূষণ ব্যবস্থাপনা (Management of industrial pollution)

বাংলাদেশে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে প্রস্তাবিত শিল্প সংক্রান্ত উদ্যোগ গ্রহণের জন্য এনভাইরনমেন্ট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট (ইসিসি) বিতরণ করা হয় (ইসিএ, ৯৫ এবং ইসিআর, ৯৭ অনুসরণে)। একমাত্র এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পর যে শিল্প সংক্রান্প্রস্তাবিত উদ্যোগটি গ্রহণযোগ্য এবং এ শিল্পের দূষণ গ্রহণযোগ্য মাত্রায় থাকবে। উচ্চ দূষণমুক্ত শিল্পকারখানার ক্ষেত্রে ইসিসি কেবল ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট পান্ট (ইটিপি)-স্থাপন এবং এ সমস্ত প্লান্ট (ইটিপি) এর ফলপ্রসূতা প্রমাণিত হবার পর প্রদান করা হয়।

২০০২ হতে ২০০৫ সাল পর্যন্ত পরিচালিত জরিপ কালে ১১,১৪৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর ৫২৪টি প্রতিষ্ঠানকে ইসিআর, ৯৭ অনুযায়ী রেড ক্যাটাকরি হিসেবে চিহ্নিত করে। ৫২৪টি লাল তালিকাভুক্ত শিল্প কারখানার মাঝে ৪১৭টি তাদের নিজস্ব উদ্যোগে ইটিপিমস স্থাপন করে এবং ১০৫টির কোনো ইটিপি বিদ্যমান ছিল না। শিল্প আইনে দূষণ নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা পূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ করে কাজে লাগাতে হবে।

(ঙ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা (Conservation of biological diversities)

বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৯ সালে ৮টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Areas) হিসেবে ঘোষণা করে। যথা–কক্সবাজার এবং টেকনাফ উপ-দ্বীপ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, হাকালুকি হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর, মারজাত হাওর, গুলশান বারিধার লেক এবং সুন্দরবনের ১০ কিমি এলাকা। ২০০৯ সালে ঢাকা শহরের ৪টি (বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ) নদী ও নদকে ইসিএ ঘোষণা করে এর সংখ্যা ১২-তে উন্নীত করা হয়। কক্সবাজার, টেকনাফ উপ-দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ এবং হাকালুকি হাওর এর জীব বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর লক্ষ্য হলো প্রতিষ্ঠানকে সুবিন্যস্ত করণের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য এবং অন্যান্য ইসিএ সমূহের সম্পদ এর সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(চ) ইকোসিস্টেম নিশ্চিতকরণ (Perfection of Ecosystem)

ভারসাম্যপূর্ণ ইকোসিস্টেম এবং পরিবেশ এর জন্য পার্বত্য এলাকাকে গুরুত্ব প্রদান করে বাংলাদেশ সরকার মার্চ, ২০০২ সালে অবৈধ পাহাড় কাটাকে নিষিদ্ধ করেছে। পাহাড় কাটা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে অবৈধ পাহাড় কাটার প্রবণতা অনেক কমে গেছে। ১৯ এপ্রিল, ১৯৯৯ সালে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Areas)-এর নোটিশ জারি হয়। এই এলাকা হলো দশ কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত সুন্দরবন সংরক্ষিত বন, কক্সবাজার এবং টেকনাফ সমুদ্রতীর, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়া, হাকালুকি হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর, মারজপট হাওর এবং গুলশান লেক। এ সকল এলাকা হতে গাছপালা সংগ্রহ, শিকার করা, বন্য পশু ধরা বা হত্যা করা, শিল্প উন্নয়ন, মাছ ধরা বা মাছ ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ বা প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর অন্য কোনো কাজ করা অথবা কোনো কাজ যা এই এলাকার মাটি বা পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট বা পরিবর্তন করে সেই সকল কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশের

বন, পাহাড়, নদী-নালা, হাওর দ্বীপ ইত্যাদিকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। এর জন্য রাষ্ট্রকেই জোর পদক্ষেপ নিতে হবে। রাষ্ট্রের জনবলকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। 'বেড়ায় খেত খায়' এমন লোক বাছাই-ছাঁটাই করে উপযুক্ত লোক দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

(ছ) ওজোন স্তর রক্ষা (Protection of ozone layer)

বাংলাদেশ ঐসব দেশের মধ্যে অন্যতম যারা ওজোন স্তর রক্ষার জন্য এবং এ সম্পর্কিত বিশ্বব্যাপি গৃহীত কার্য সম্পাদনের উলেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ওজোন স্তর ক্ষয়ে দায়ী বস্তু সম্পর্কিত মন্ট্রিল প্রটোকল-এ প্রবেশের পর বাংলাদেশ-এর সব ধরনের সংশোধনে স্বাক্ষর প্রদান করে যথা–লন্ডন সংশোধন, মনট্রিল সংশোধন, কোপেনহেগেন সংশোধন এবং খুব সম্প্রতি বেইজিং সংশোধন। ২০১০ সালের ১লা জানুয়ারি হতে বাংলাদেশ এ্যারোসোল সেক্টর, রেফ্রিজারেটর এন্ড এয়ারকন্ডিশনার সেক্টর, অন্যান্য বাণিজ্যিক সেক্টর হতে সিএফসি'স (ক্লোরোফ্লোরোকার্বন) পরিত্যাগ করেছে। মনট্রিল প্রটোকল অনুযায়ী ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে কিছু পরিমাণ সিএফসি'স মিটারডডোস ইনহেলারস (এমডিআই) তৈরিতে ব্যবহৃত হয় যা সাধারণত এ্যাজমা রোগীদের জন্য এবং ইসেনশিয়াল ইউজ নোমিনেশন (ইইউএন) এর আওতায় সিওপিডি রোগীদের জন্য কিছু সিএফসি ব্যবহৃত হয়। ২০১২ সালের মধ্যে সিএফসি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার কথা ছিল। তা এখনও সম্ভব হয়ে উঠেনি। পরিবর্তনমূলক কৌশল এবং রূপান্তরের জন্য গৃহীত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে এমডিআই প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলো হতে এমডিআই তৈরিতে ব্যবহৃত সিএফসি পরিত্যাগের বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা দেয়ার কথা রয়েছে।

(জ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Wastage management) নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে গৃহস্থালী এবং অন্যান্য নানাবিধ বর্জ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্জ্যের আয়তন এবং পরিমাণ হ্রাসের মাধ্যমে বর্জ্য পুনব্যবস্থার এবং বর্জ্যের প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ন্যাশনাল থ্রি-আর (রিডিউস, রি-ইউজ, এন্ড রিসাইকেল) প্রোগ্রাম ইউনাইটেড ন্যাশনাল সেন্টার ফর রিজিউনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএনসিআরডি) এর সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রকার পুনব্যবহার এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বাস্তবায়নধীন রয়েছে। বর্জ্যের হ্রাসকরণ, পুনঃব্যবহার এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বাংলাদেশে একটি জাতীয় কৌশল গঠন করা হয়েছে। দেশে পশুসম্পদ এবং হাঁস-মুরগী বেড়ে যাওয়ায় প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে গোবর এবং হাঁস-মুরগীর বিটা আবর্জনা উৎপাদিত হচ্ছে। এই জৈব পদার্থ নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জৈবসার-এর ভাল উৎস হতে পারে।

(ঞ) নদীরক্ষা নিশ্চিতকরণ (Saving the river)

ঢাকা শহরের বুড়িগঙ্গা নদীর পাড় অবৈধ দখলের পর্যায়ে প্রশমনের বিষয়ে এবং নদী দূষণের পরিমাণ কমানোর উপায় বের করা পরিবেশ অধিদপ্তরের দায়িত্ব। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত কার্যাবলি গ্রহণ করা হয়েছে:

- নদী পাড়ের বিভিন্ন কাঠামোর উপর জরিপ পরিচালনা করা এবং দখলদাররা কীভাবে ভূমি অধিগ্রহণ করছে তা নিরূপণ করা এবং ভবিষ্যত অবৈধ স্থাপনা উৎখাতের কার্যাবলির পরিকল্পনা তৈরি করা।
- নদীর দুইপাড়ের শিল্পকারখানায় দূষণ চিহ্নিত করা, শ্রেণিবিভাগ করা এবং দূষণ কমানোর জন্য সুপারিশ তৈরি করা;
- বুড়িগঙ্গা নদীতে বর্জ্য নিঃসরণ এর হার এবং এর দূষণমাত্রা নির্ধারণ করা এবং এর সুব্যবস্থাপনাকরণের জন্য পরামর্শ বা সুপারিশ তৈরি করা।

জানুয়ারি, ২০১০ হতে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কমিটি ঢাকা শহরকে ঘিরে অবস্থিত বুড়িগঙ্গা নদী পরিদর্শন করে এবং নিমজ্জিত বর্জ্য সরানোর কাজ শুরু করে :

- নদীর পানির মান পরিবীক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা, পানির মান পর্যবেক্ষণ করা, কারণ এবং উৎস খুঁজে বের করা, এ্যাকশন প্ল্যান তৈরি এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- শিল্প এলাকায় আকস্মিক পরিদর্শন পরিচালনা করে আইন অমান্যকারী দূষণমুক্ত শিল্প কারখানা চিহ্নিত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সরকারের আইনের আশ্রয় গ্রহণের বিষয়ে হাইকোর্টের রায় অনুসরণে একটি খসড়া নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে যাতে করে ঢাকা শহরের চারদিকে বেষ্টিত নদীসমূহ সংরক্ষণ এবং প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) হিসেবে ঘোষণা করা যেতে পারে।

(ট) পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধকরণ এবং বিকল্প পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণ (Ban for polythene shopping bag)

বাংলাদেশ সরকার ১ মার্চ, ২০০২ হতে সারাদেশে সব ধরনের পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং কার্যকর করে। একই বছর পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এ '৬-ক' নামে একটি অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সমিতি এবং চেম্বার অব কমার্স এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে এবং তাদের তৈরি খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাজারজাত করণে সমস্যা বিবেচনা করে সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এর '৬-ক' অনুচ্ছেদে পরিবর্তন আনয়ন করে দ্রব্য সামগ্রী প্যাকেটজাত করণের জন্য ৫৫ মাইক্রোন এর কম পুরু পলিথিন শপিং ব্যাগকে মাছের চালান পরিবহণের ক্ষেত্রে অনুমোদন দেয়া হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর পলিথিন ব্যাগের উপর অর্পিত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং ঘনঘন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকে।

(ঠ) চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ (Medical waste management and Controll)

চিকিৎসা বর্জ্যের নিরাপদ এবং পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ নীতির আওতায় 'মেডিক্যাল ওয়াস্ট (ম্যানেজমেন্ট এন্ড প্রসেসিং) রুলস-২০০৮' জারী করে। এই আইন পরিবেশগত নিরাপদ বিযুক্তি প্যাকেটজাতকরণ, মজুতকরণ, পরিবহণ, চিকিৎসা এবং সর্বশেষে ধ্বংসকরণ পর্যন্ত বিষয়ে যথাযথভাবে নির্দেশনা প্রদান করেছে। বেসরকারি বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ সিটি কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপ্যালিটিজ এর সাথে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ঢাকা শহরের বেসরকারি সংস্থাসমূহকে কার্যকরভাবে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনাগত সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ-এর ভূমিকা পালন করে। জাইকা-এর সহযোগিতায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ২০ বছরের মাস্টার প্লান গ্রহণ করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং বিধির চাহিদা অনুযায়ী সার্বিক দিক নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

(ড) পরিবেশ রক্ষায় এনজিওদের কার্যাবলি (Function of NGO's to environment conservation)

সরকারের সহযোগিতায়, কিছু সংখ্যক এনজিও ১৯৮০ সাল হতে দেশের দূষণ অর্থনীতি ও পরিবেশ এর সমস্যা এবং পরিবেশগত পদ্ধতির উন্নয়ন সাধনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশ রক্ষা এবং পরিবেশগত সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কিছু এনজিও পরিবেশগত সমস্যা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর মধ্যে রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দা কনভারশন অব ন্যাচার (আইইউসিএন), সেন্টার ফর সাসটেইনেইবল ডেভেলপমেন্ট (সিএসডি), বাংলাদেশ সেন্টার ফর এ্যাডভ্যান্সড স্টাডিস (বিসিএস), এনভাইরনমেন্টাল কনভারসন ম্যানেজমেন্ট সেন্টার, ওয়েস্ট কনসার্ন, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লয়ার্স এসোসিয়েশন (বেলা) ইত্যাদি। দূষণ অর্থনীতি, পরিবেশ সুরক্ষা, গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দূষণ অর্থনীতির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করে তুলছে। পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকের ভূমিকা পালন করছে।

(ঢ) বনজ সম্পদ সংরক্ষণ (Conserving forest resources)

বন বিভাগ ভৌত, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা করা এবং টেকসই ভূমি ভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের বন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পুরাতন ধরনের পদ্ধতি। শুরুতে বন বিভাগের প্রধান কাজ ছিল বনকে রক্ষা করা এবং টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। বন সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং জীববৈচিত্র্যে সুসামঞ্জস্য অর্জনের জন্য সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে ভূমির ২০ শতাংশ বনায়নের আওতায় আনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জীববৈচিত্র্যে সংরক্ষণ এবং বন্য পশু, পাখি ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য ২৮টি সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে ১৯টি এলাকা সহব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সামাজিক বনায়ন বনবিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। ১৯৮১ সাল হতে বন বিভাগ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহযোগিতায় ৪টি সামাজিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বনবিভাগ এ সব সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। গত তিন বছরের বন বিভাগ সামাজিক বনায়ন বিষয়ে ৪৬,০২১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে যা দরিদ্র গ্রামীণ জনগণকে এ সম্পদ হতে লাভবান হতে সাহায্য করেছে। বিভিন্ন সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৬,৪৮৪ হেক্টর অবৈধ এবং পতিত বন এলাকা ইতোমধ্যে সামাজিক বনায়নের আওতায় আনা হয়। বনায়ন কর্মসূচিতে যোগদানের পর মহিলাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা অনেকাংশে দূর হয়েছে। সামাজিক বনায়ন কেবল কাঠ, জ্বালানি কাঠ, ফল সরবরাহ এবং পরিবেশের অবস্থার উন্নয়ন করে না, এটি দারিদ্র্য দূরীকরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(ণ) পরিবেশগত স্বাস্থ্য সমস্যা ও সংরক্ষণ (Environmental health problem and protection)

পরিবেশগত স্বাস্থ্য বলতে মানব স্বাস্থ্য এবং রোগের ঐ সকল দিকের সংগঠন যা পরিবেশের উপাদানসমূহ নিরূপণ করে থাকে। পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য ঝুঁকি হলো শিল্প সংক্রান্ত এবং চিকিৎসাগত বর্জ্য, দূষিত বায়ু এবং পানি নির্গমন, মানব বর্জ্য, ভোগ্যপণ্য, জীবন-ধারণ মান এবং আয়নিত ও আয়নিত হীন বিকিরণ। স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব সম্পর্কিত পরিচিত এবং সন্দেহজনক পরিবেশগত রোগের কারণের মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব, ক্যান্সার, হৃৎপিন্ড এবং ফুসফুস সংক্রান্ত রোগ, এ্যাজমা এবং অন্যান্য শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত রোগ, এলার্জি, স্নায়ু বিষাক্ততা এবং স্নায়ু বৈকল্য, পাকস্থলী ও আন্ত্রিক জনিত রোগ, ক্রমবর্ধমান এবং জন্মগত অপ্রকৃতস্থতা এবং তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ি বিষক্রিয়া ইত্যাদি।

বর্তমানে বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে পরিবেশগত স্বাস্থ্য ঝুঁকির পরিণাম সম্পর্কে অন্যান্য দেশে বিদ্যমান পরিবেশগত স্বাস্থ্য বিষয়গুলো নজরে এনে বলা যায় যে, বাংলাদেশে দূষণ এবং পরিবেশগত স্বাস্থ্য সমস্যা অত্যন্ত তীব্র কিন্তু বাংলাদেশে এই অসুবিধা মূল্যায়নের জন্য বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের দক্ষতার অভাব রয়েছে এবং সীমিত কিছু পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্যগত নীতি রয়েছে। একটি জাতীয় পরিবেশগত স্বাস্থ্য কর্মসূচির মূল কার্যকরী উপাদান হিসেবে গবেষণা কৌশল, পরিবীক্ষণ, সক্ষমতা উন্নয়ন, মূল্যায়ন এবং পরিবেশগত ঝুঁকি ও বিপদ হ্রাস এবং বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনীয় নীতিসমূহ জানানোর জন্য প্রতিষ্ঠানিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ মানোন্নয়ন এবং সিদ্ধান্ত তৈরিতে নির্দেশনা প্রদানের বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে একটি সামগ্রিক পরিবেশগত স্বাস্থ্য বিষয়ক সক্ষমতা এবং একটি ব্যবহারিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি গঠন করণের জন্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত খাতগুলোর উন্নতি সাধন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণার অন্তর্ভুক্তি, সরকার, শিল্প এবং এনজিওসমূহ-এর পাশাপাশি এইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় এবং সহযোগিতা গঠন করা প্রয়োজন।

৫. পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক উদ্যোগ (International enterprising of environmental protection)

সত্তর এর দশকের শুরুত্ব থেকেই পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়ে আসছে। ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত স্টকহোম কনফারেন্স (UN conference on the human environment) এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিবেশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান (Environmental Agencies) গঠন ও জাতীয় পরিবেশ কর্মপরিকল্পনা/নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৮৮ সালে বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত "Intergovernmental Panel on Climate Change" (IPCC) এর সুপারিশমালা গ্রহণ আন্তর্জাতিক উদ্যোগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আরেকটি পদক্ষেপ হচ্ছে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর আওতায় ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত কিয়াটো প্রটোকলের নেগোসিয়েশন। ক্ষতিকর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও গ্রীনহাউজ গ্যাস উদগীরণ কমানের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত কিয়োটো প্রটোকল এপ্রিল, ২০১২ পর্যন্ত বিশ্বের ১৯১টি (ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ) দেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত (ratified) হয়েছে। ২০১২ সালে Kyoto Protocol-এর প্রথম Commitment Period শেষ হয়েছে। বর্তমানে গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধির ফলে Kyoto Protocol এর স্বাক্ষরকারী উন্নত দেশসমূহের বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে উন্নয়নশীল দেশসমূহের অবদান মাত্র ২৭ ভাগ। ইতোমধ্যেই রাশিয়া, জাপান ও কানাডা Kyoto Protocol থেকে বের হয়ে আসার ঘোষণা দেয়। সে প্রেক্ষাপটে Kyoto Protocal এর বৈশ্বিক গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণে অবদান মাত্র ১৫ ভাগে নেমে আসবে। গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমণকারী বিশ্বের নির্বাচিত কয়েকটি দেশের তালিকা সারণি-১ এ দেয়া হলো :

সারণি-১ : বিশ্বের নির্বাচিত দেশসমূহে গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমণের বিবরণ

ক্রমিক নং	দেশ	মোট নির্গমণ (CO_2 মিলিয়ন মেট্রিক টনস)	শতকরা নির্গমণ
১.	চীন	৭,৭১১	২৫.৪
২.	যুক্তরাষ্ট্র	৫,৪২৫	১৭.৮
৩.	রাশিয়া	১,৫৭২	৫.২
৪.	ভারত	১,৬০২	৫.৩

৫.	জাপান	১,০৯৮	৩.৬
৬.	জার্মানী	৭৬৬	২.৫
৭.	কানাডা	৫৪১	১.৮
৮.	যুক্তরাজ্য	৫২০	১.৭
৯.	দক্ষিণ কোরিয়া	৫২৮	১.৭
১০.	ইরান	৫২৭	১.৭

উৎস : *EIA (Energy Information Administration) এর ২০০৯ সালের তথ্য।*

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে ডিসেম্বর ২০০৯ এ অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনে ১৯৪টি দেশ, অসংখ্য পরিবেশবাদী সংগঠন এবং বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করে "কোপেনহেগেন সমঝোতা" নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ সম্মেলনে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামিয়ে আনার জন্য বিশ্বব্যাপী কার্বন নির্গমণ কমিয়ে আনার নিমিত্ত একটি "বাধ্যতামূলক আইনি চুক্তি" প্রণয়ন করার জন্য সমঝোতার সঙ্গে সুপারিশ করা হয়। সল্পোন্নত দেশসমূহের নাজুকতা উপলব্ধি করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজন মেটাতে ২০২০ সাল পর্যন্ত উন্নত দেশগুলো যৌথভাবে প্রতিবছর ১ হাজার কোটি ডলার দেয়ার সুপারিশ করে।

পরিবেশ সংরক্ষণে পরিবেশ অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে,

- পরিবেশ সংরক্ষণে পানি, বায়ু, মাটি ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ; পাহাড় কাটা ও জলাধার ভরাটরোধ, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা চিহ্নিতকরণ ও এর পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দূষণকারীদের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্টের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায়, রিডিউস-রিইউজ-রিসাইক্লিং (থ্রি-আর) কে উৎসাহিত করার মাধ্যমে পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করা;
- শিল্প বর্জ্য, ভূ-উপরিস্থ পানি, বায়ুর গুণগতমান পরিবীক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে কার্যকর অবদান রাখা,
- পরিবেশ আইন ও বিধিমালার যুগোপযোগীকরণ এবং বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধানের যথার্থ প্রয়োগ;
- পরিবেশ আদালতে মামলা পরিচালনাসহ উচ্চ আদালতে রীটমামলা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ;
- জনগণের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ, প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে মিট দ্য পিপল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের পরিবেশ সংশ্লিষ্ট সমস্যা শ্রবণ যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহকে পরিবেশ বিষয়ে মতামত/পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণে যেসব কাজ হয়েছে,

- পরিবেশ অধিদপ্তরের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে গত পাঁচ বছরে নতুন ৮১২টি শিল্পকারখানায় বর্জ্য পরিশোধনাগার বা ইটিপি স্থাপিত হয়েছে।
- একই সময়ে প্রায় ২১৪১টি বায়ুদূষণকারী ইটভাটা আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।
- বায়ুমান পরিবীক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
- Pollutes Pay Principle-এর আওতায় শিল্পদূষণ, বায়ুদূষণ, পাহাড় কাটা, নদী ও জলাশয় ভরাটের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধনের জন্য গত জুলাই ২০১০ হতে এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় ১৭৮৮টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রায় ১০৭ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে।
- গত পাঁচ বছরে অবৈধ পলিথিন শপিং ব্যাগ বিরোধী ৬৪২টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ২৬৭ টন পলিথিন জব্দ, ৬২টি কারখানা বন্ধ এবং প্রায় ৪ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

৬. প্রবৃদ্ধি ও সমতায়নে দূষণনীতি প্রয়োগযোগ্যতা ও বাস্তবায়ন (Applications for Growth and Equity in Pollution Policy)

প্রবৃদ্ধি ও সমতার জন্য দূষণনীতির কতগুলো কর্মসূচি (programs) বা বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও

সমতায় কতগুলো নীতি গ্রহণ করা হয়েছে (৪ অনুচ্ছেদ) এই নীতিগুলো বাস্তবতায় কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা আলোচনার বিষয় ।

১. বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ঢাকা শহরে টু-স্টোক থ্রি-হুইলার (১ জানুয়ারী ২০০৩ সালে) যানবাহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাস্তবে পুরাতন গাড়ির কালো ধোয়ার বিষয়ে নোটিশ করা হলেও বাস্তবে তা আইনের সামনে চলমান আছে। বায়ু দূষণকে আরও বেশি করে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগ করার জন্য নির্ধারিত লোক নিশ্চয় বিনিময়ের কারণে কোনো কথা বলছে না। ২০১০ সালের পর ইট ভাটার চিমনী ১২০ ফুট দীর্ঘস্থায়ি অনুমোদন দিবে না। বাস্তবে তা প্রয়োগ হয়নি ।

২. যানবাহনের কালো ধোয়া নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্বে ট্রাফিক ব্যবস্থা কাজ করার কথা। বাস্তবে তারা নিজেদের সামান্য স্বার্থের জন্য তা নিয়ন্ত্রণ করছে না ।

৩. শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ২০০৬ সালে আইন পাশ হয়। ২০১০ সালের মধ্যে ৯০-১১০ ডেসিবেল হতে ৪৫-৫৫ ডিসেবেল পর্যন্ত শব্দ দূষণের মাত্রা কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় বাস্তবে তা কার্যকর হয় নি ।

৪. শিল্প সংক্রান্ত দূষণ ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় থাকার আইন করা হয়। বাস্তবে জরিপ গবেষণায় ৫২৪টি শিল্প তালিকাভুক্ত। শিল্প কারখানার মধ্যে ৪১৭টি তাদের নিজস্ব উদ্যোগে ইটিপিমস স্থাপন করে এবং ১০৫টির কোনো ইটিপি বিদ্যমান নেই ।

৫. বৈচিত্র্য সংরক্ষণে ৮টি এলাকাকে সংকটনাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। যেমন–কক্সবাজার, টেকনাফ উপদ্বীপ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, হাকালুকি হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর, মারজাত হাওর, গুলশান বারিধারা লেক, সুন্দরবনের ১০ কি.মি. এলাকা। এছাড়া ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী, শীতলক্ষা, তুরাগ, বালুনদী সংকটাপন্ন ঘোষণা করা হলেও পরিবেশগত প্রবৃদ্ধি ও সমতা আনয়নের লক্ষ্যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে হয়নি ।

৬. ইকোসিস্টেম এর জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি ।

৭. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কোনোরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বার বার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কাজ শুরু করে দীর্ঘসময় মেয়াদে চলেনি। ফলে যেই-সেই অবস্থা রয়েছে ।

৮. নদীরক্ষার বিষয়ে সবগুলো জেলা পরিষদ হাইকোর্টের আইনের মাধ্যমে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি ।

৯. পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধকরণ আইন থাকলেও অবাধে ক্রয় বিক্রয় চলছে। দেখার কেউ নেই, কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। আইনের লোকও ইহা বেশি করে ব্যবহার করে। কারণ কর্ম করে ফেরার পথে পলিথিন দিয়ে বাজার নিয়ে বাসায় যায় ।

১০. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে হাসপাতালগুলোর উপর নজরধারী রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ হয়। সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপিলিটি প্রতিষ্ঠান কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আইনত ভূমিকা পালন করার কথা। তারা এই বর্জ্য কোথায় সংরক্ষণ করেছে তা অবশ্য পরিবেশ দূষণে আর এক নুতন অধ্যায় সৃষ্টি করছে। ফলে হিতে বিপরীত হচ্ছে ।

১১. ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট, নগরবাসীর ফুটপাথ রক্ষার ক্ষেত্রে নগর পিতারা এখনও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। উদ্যোগ নিলেও হকার আন্দোলন, রাজনৈতিক দলের লোকদের অসহযোগিতার কারণে দখলমুক্ত করতে পারেছে না ।

পরিবেশগত সমতা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় আইন, গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কার্যকরি ভূমিকা পালনের জন্য এগিয়ে আসে নি। উপর থেকে ধাক্কা খেলে ২/৪ দিন ভাল কাজ করে। পত্রিকায় প্রচার হয়, তা আবার যেই সেই। পরিবেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে একই অবস্থা। কাজেই প্রবৃদ্ধি ও সমতায়নে দূষণনীতিগুলো কাগজে আছে, বাস্তবে গ্রহণযোগ্য নয় ।

৭. উপসংহার (Conclusion)

দূষন অর্থনীতির মাত্রাগত ব্যাপ্তি যেসব কারনে হয়ে থাকে যেমন বায়ু দূষন, পানি দূষণ, আর্সেনিক দূষন, মাটি দূষন, তেজস্ক্রিয় দূষন, শব্দ-দূষন ইত্যাদি পরিবেশকে মারাত্মক দূষনে দিকে নিয়ে যায়। আর এসব দূষন সৃষ্টির মূলে মানুষই দায়ী। প্রাকৃতিক ভাবে যেরূপ দূষন সৃষ্টি হয় তা প্রাকৃতিক ভাবে পরিশোষন হয়ে থাকে বিধায় প্রাকৃতিক দূষনকে সমস্যা বলে মনে করা যায় না। সমস্যা আছে মূলত: মনুষ্য সৃষ্ট দূষণ ও দূষণ অর্থনীতি, দূষন পরিবেশ যা মানুষ এর নিয়ন্ত্রন ও ভারসাম্য সমতায়নে ব্যর্থ-হয়। এই অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য উন্নয়নশীলদেশ যারা দূষন দ্বারা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্ষতিপূরন গ্রহন করে এর কিছুটা হলেও লাঘব করা সম্ভব। এজন্য উন্নত দেশ যারা বিশ্বব্যাপি দূষন অর্থনীতির জন্য দায়ী তারা ক্ষতিপূরন দিবে পরিবেশে ক্ষতিগ্রস্থ দেশ গুলোকে। এই ক্ষতিপূরন দ্বারা দূষন অর্থনীতি ও পরিবেশ যত টুকু সম্ভব নিয়ন্ত্রন করে রাখবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, উন্নয়নশীলদেশ গুলো তারা নিজেরাই নিজেদের দেশ ও পরিবশকে দূষন করছে। যেমন বাংলাদেশের শিল্প কারখানায় বৈর্জ্য নদী-

নালা, খাল-বিলে প্রবাহিত হওয়ার কারনে পানি, বায়ু, মাটি, গন্ধ শব্দ, আর্সেনিক দূষণ দ্বারা মানুষ ও প্রানীকূল ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। মনুষ্য সৃষ্ট দূষনের কারনে নিজস্ব দেশের জলবায়ু আবহাওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছে। রাজনীতি, অর্থনীতির ব্যক্তি এবং দেশের সরকার, দেশের মানুষের বিশুদ্ধ নিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য নিবিড় ভাবে চিন্তা ভাবনা কম করছে। রাজনীতি, অর্থনীতির, সামাজিক আস্থিতিশীলতা ও অস্থিরতার কারণে এসব বিষয়ে কম ভাবছেন। গুটি ব্যক্তি, কয়েকজন সমাজসেবক ও দেশাত্ববোধক ব্যক্তি এ বিষয়ে সার্বক্ষনিক ভাবছেন, তারা সেমিনার, সিমপোজিয়াম, মানব বন্ধন, লং মার্চ করে যাচ্ছেন। সরকার এসব বিষয়ে মাথ কম ঘামাচ্ছেন। ফলে দেশীয় চিন্তা ভাবনার ফলাফলের গুণগতকার্যকরনের মাত্রা রাষ্ট্রীয় ভাবে কাজ করছে না। এই অবস্থায় আর্থিক, পারিপার্শ্বিক ও নৈতিক স্বদেশীয় চিন্তা ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে কাজে লাগাতে হবে। দেশের প্রত্যন্ত আঞ্চলে দূষণে আক্রান্ত সব পরিবেশ ও এর মানুষ জনকে জাগিয়ে তুলতে হবে। নৈতিকতার আদর্শকে সবার মাঝে জাগরিত করতে হবে। এক্ষেত্রে গুটি কয়েক সচেতন নাগরিক ও সংস্থা কাজ করলে চলবেনা। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, সংস্থা, দপ্তরকে আর্থিক সহযোগিতাসহ এগিয়ে অসতে হবে। দেশের সব এলাকার মানুষের মধ্যে সেচ্ছায় সচেতনতাবোধ জাগ্রত করে তুলতে হবে। তবেই কেবল দূষন নিয়ন্ত্রন ও পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় সফলতা আসবে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর যারা পরিবেশকে দূষন করে যাচ্ছে তাদের ক্ষতিপূরন দ্বিগুন নয় বহুগুনে বৃদ্ধি করলেও কাজে আসবে না। যতক্ষন পর্যন্ত না আমাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। কারন অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মানুষের বদ অভ্যাস হলো "বেড়ায় খেত খাওয়ার মত"। রাষ্ট্র, দেশ, মানুষ, সমাজ সবাই সচেতন থেকে কাজ কারলে দূষন অর্থনীতি ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রনে আনা দীর্ঘমেয়াদে সম্ভব।

Bibliography / গ্রন্থপুঞ্জি

1. Anastasios, X. (1997); **Advanced Principles in Environmental Policy,** Edward Elgar.
2. Barry C Field**; Environmental Economics, An Introduction**.
3. Baumol, W.J. and W.E. Oates, (1988); **The Theory of Environmental Policy,** Cambridge University Press.
4. Clifferd, S.R. (2001); **Applying Economics to the Environment**, Oxford University Press.
5. David, P. et al. (1990); **Sustainable Development : Economics and Environment in the Third World,** Edward Elgar.
6. **Eugine,** T; **Environmental Economics**,Vrinda Publication (P) Ltd. University of Massachusetts Megraw Hall Co. N.Y.
7. Goldin, Ian and L. Alan Winters, ed., (1995); **The Economics of Sustainable Development,** Cambridge University Press.
8. Gunter, S & Jeremy J. Warford. (1994); Environmental Management and Economics Development, John Hopkins University Press.
9. Keith, C. (2000); **Economic Development and Environmental Gain,** Earth Scan Publication Ltd.
10. Pearce, David and et al., (1990); **Sustainable Development : Economics and Environment in the Third World,** Edward Elgar Publishers Ltd.
11. **Pearce,** David W and R. Kerry Turner; **Economic of Natural Resources and the Environment,** Harverter Wheatsheat, N.Y. Mayur Vihar, Delhi-110001.
12. Pearce, David W. and Jeremy J. Warford, (1993); **World Without End : Economics, Environment and Sustainable Development,** Washington D.C. : Oxford University Press.
13. Rajarathanam, K. (1993); **Development and Environmental Economics**, C.R.N.I.E.O.
14. **Rouf,** Dr Kazi Abdur; **Environment and Resource Management,** Shujonesu Prokashani, Dhaka-1100.
15. **Rouf,** Dr Kazi Abdur**; Geography and Human Environment**, Shujonesu Prokashani, Dhaka-1100.
16. Scott, J & Janet M. Thomas; **Environmental Economics and Management,** Harcourt College Publishers.
17. Seneca, Joseph. J. Taussing M. K. (1979); **Environmental Economics,** New Jersey, Prentice Hall.
18. Thomas, H. (1999); **Environmental and Natural Resources Economics,** Addison Wesley Publications.
19. William, A (1991); The Encyclopedia of Environmental Studies, Facts of Life.
20. সিকদার, অধ্যক্ষ জহিরুল ইসলাম; জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য অর্থনীতি, কনফিডেন্স প্রকাশনী, ২০১৫।

21. সিকদার, অধ্যক্ষ জহিরুল ইসলাম; পরিবেশ ও সম্পদ অর্থনীতি, কনফিডেন্স প্রকাশনী, ২০১৫ ।
22. নিশাত, আইনুন; পানি বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশবিদ, দৈনিক প্রথম আলো ।
23. স্যাকস, জেফরি; কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকসই উন্নয়নের অধ্যাপক ।
24. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫); সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।
25. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০০, ২০০৫, ২০১০, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ ।
26. বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১; রূপকল্প ২০২১ বাস্তবে রূপায়ন; সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।
27. বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০১৪, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।
28. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।